নবাগত

সূচি

আতংক

ইংরেজি মাসের জুন থেকে সেপ্টেম্বর অবধি প্রত্যেক মাসের প্রথম শনিবার মিলিবৌদিদের ডেলাফিল্ডের বাড়ীতে একটা আড্ডা বসে। মিলিবৌদির স্বামী শুভেন্দু দত্ত পেশায় ডাক্তার, খুব আমুদে লোক। তাদের মেয়ে তপতী ইঞ্জিনিয়ারিং-এ দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্রী এবং ছেলে নবেন্দু বারো ক্লাসের ছাত্র। হাইওয়ে ৯৪ উইসকনসিনের রাজধানী ম্যাডিসন আর উইসকনসিনের সবচেয়ে বড় শহর মিলওয়াকির মধ্যে যাতায়াত করার প্রধান সড়ক। হাইওয়ে ৯৪-এর শুরু আমেরিকার মিচিগান রাজ্যের বন্দর শহর হিউরণ থেকে আর শেষ হচ্ছে মন্টানা রাজ্যের বিলিং শহরে। হাইওয়ে ৯৪-এর ধারেই ছোট্ট শহর ডেলাফিল্ড, মিলওয়াকি থেকে মাইল তিরিশ পশ্চিমে। আমেরিকার পূর্ব থেকে পশ্চিমপ্রান্তে মোটরগাড়ী করে যেতে সময় লাগে প্রায় সাতদিন, অবশ্য যদি দিনে আট-ন' ঘণ্টা। ঘণ্টায় একশো কিলোমিটার বেগে গাড়ী চালানো যায়। ওদেশে গাড়ীর রাস্তা খুবই ভালো। দেশভ্রমণে সবচেয়ে বেশি লোক গাড়ী ব্যবহার করে, তারপর উড়োজাহাজ। রেলগাড়ীতে চড়ে খুব কম লোক, কারণ ওদেশে রেলগাড়ীতে দেশভ্রমণের খরচ সবচেয়ে বেশী। তাই ওদেশে ট্রেনে চাপা প্রায় বিলাসিতার পর্যায়ে পড়ে। ওদেশের আর একটা আশ্চর্য্য ব্যাপার হচ্ছে কোনও রাজ্যের রাজধানীই সেই রাজ্যের বৃহত্তম শহর নয়। উদাহরণস্বরূপ উইসকনসিনের কথা তো আগেই বলেছি। আরও ধরুন ইলিনয় রাজ্যের রাজধানী স্প্রিংফিল্ড, কিন্তু ঐ রাজ্যের সবচেয়ে বড়ো শহর চিকাগো। নিউইয়র্ক রাজ্যের সবচেয়ে বড় শহর নিউইয়র্ক সিটি অথচ ঐ রাজ্যের রাজধানী আলব্যানী। এমনকি গোটা আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের রাজধানী ওয়াশিংটন, ডিসি আমেরিকার বৃহত্তম শহর নয়, ঐ গৌরবের অধিকারী নিউইয়র্ক। ফলে দেবাটাকে একসেন্ট্রিক বললে ভুল বলা হবে না। যিনি প্রথা মেনে চলেন না ঐরকম লোককেও একসেন্ট্রিক বলা যেতে পারে। গোটা দেশটাই এই প্রথা বিরোধিতায় ব্যস্ত। অবশ্য এদেশে রক্ষণশীল লোকের সংখ্যা নেহাৎ কম নয়—কথাটা শুনতে আশ্চর্য্য লাগলেও কিন্তু সত্যি।

দূরভাষ বা ফোন ওদেশের সর্বত্র। ফোনে বাক্যালাপ তো আছেই এছাড়াও দৈনন্দিন প্রয়োজনীয় অনেক কাজই ফোনে সারা যায়। ওদেশে ফোন তাই নিত্যপ্রয়োজনীয় সামগ্রীর

মধ্যে পড়ে। এখন ফোনের উন্নতি হয়েছে অনেক। বাড়ীতে কেউ না থাকালেও ফোনের যন্ত্রে নিজের বক্তব্য বলে রাখা যায়। একজনের সাথে ফোনে কথা বলতে বলতে অন্য কেউ ফোন করলে বোঝা যায় যে আর একজন ফোন করছেন। ইচ্ছে হলে ঐ অন্যজনের সাথে প্রয়োজনীয় কথাও বলা যেতে পারে। এছাড়াও আরও কিছু সুবিধা আছে ফোন থাকার। তবে যখনকার ঘটনা নিয়ে এই গল্প তখন ফোনের এত উন্নতি হয়নি।

আগের কথায় ফিরে যাই, ডেলাফিল্ডের মিলি বৌদিদের বাড়ীতে মাসের প্রথম শনিবারের আড্ডায় ছ-সাতটি বাঙ্গালী পরিবার জড়ো হন। কেউ আসেন মাইল পঞ্চাশ দূরের ম্যাডিসন থেকে। কেউ আসেন মিলওযাকি থেকে। মিলিবৌদিদের বাড়ী নাগাউইকা হ্রদের গায়ে। নাগাউইকা ছোটো হ্রদ, আয়তনে সাড়ে চার হাজার বিঘার মতো। বাড়ীর পেছনের বাগান হ্রদের সংলগ্ন। হ্রদের ওপর কাঠের তক্তা দিয়ে 'ডেক্' বা চাতাল করা আছে। ম্যাডিসনের সুফল রায় ঐ আড্ডাতে নিয়মিত সপরিবারে আসেন। উনার মাছ ধরার খুব সখ। কখনও নাগাউইকা হ্রদে কখনও মাইল ছয়েক দূরের বার্ক নদীতে মাছ ধরেন দুই বন্ধু—সুখেন ও শুভেন্দু। হ্রদে নরদার্ন পাইক মাছ পাওয়া যায় ভালোই। মাছটা স্বাদে অনেকটা ভারতের গুরজাওলী মাছের মতো। এছাড়া ব্যাস মাছও পাওয়া যায় হ্রদে। বার্ক নদীতে ট্রাউট মাছ পাওয়া যায় প্রচুর। সারাদিনে যা মাছ ধরা হয় তা সন্ধ্যেবেলায় ভাজা হয়। শুভেন্দু নিজে মদ খায় না। তাই মাছভাজার সাথে বীয়ার যোগান দেন মিলওয়াকির প্রদীপ মিত্র। উনি হাজির হন ছটা নাগাদ। আরও তিন চারটি পরিবারও আসেন ঐ আড্ডায়। যেদিনকার আড্ডা নিয়ে এই গল্প সেদিন আড্ডায় হাজির ছিলেন দীপ্তি ও সুখেন রায়, মায়া ও রবীন মুখার্জী এবং তাদের একমাত্র ছেলে গৌতম, প্রদীপ মিত্র যার সম্প্রতি বিবাহ বিচ্ছেদ হয়েছে ফলে উনি একাই এসেছেন। নির্মলা ও রাজেশ তণ্ডুলকর এবং তাদের দুই মেয়ে বাসন্তী ও পদ্মা। এছাড়া এসেছিলেন মিমি মিত্র ও সুলোচনা মহাপাত্র—এরা দুজনেই উইসকনসিন বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রী।

অভ্যাগতরা সবাই কিছু না কিছু রান্না করে আনেন। ফলে গৃহকর্ত্রীকে সব কিছু রান্না করতে হয় না। এ ধরনের নেমতন্নকে ওদেশের ভাষায় বলা হয় 'পঠলাক ডিনার' বাংলা অনুবাদ করলে দাঁড়ায় হাঁড়ি ভাগ্য ভোজ অনুবাদটি খুব একটা শ্রুতিমধুর নয়। এই ভোজে যার যা খুশি রান্না করে আনতে পারেন। যেমন—দীপ্তি রায় এনেছিলেন বাফেলো মাছ (অনেকটা বাংলার কাতলামাছের মতো) দিয়ে থাইল্যান্ডের ঢঙে রাঁধা থাইফিস কারি। প্রদীপ মিত্র ভালো মাংস রান্না করেন। উনি এনেছিলেন ভেড়ার মাংসের কোর্মা। এমনি সবাই এক একটা পদ এনেছিলেন। যার বাড়ীতে আড্ডা বসে তিনি সাধারণত ভাত আর একটা কিছু তরকারী করেন। ফলে রান্নার জন্য সারাদিন রান্নাঘরে কাটাতে হয় না কাউকেই। এক কথায় বলতে গেলে সবাই নিজের খুশিমতো রান্না করে এনে আড্ডায় সামিল হন। তাই একে খুশিভাতি বলা যেতে পারে।

হেনিকেন বীয়ারের সাথে মাছভাজা খেতে খেতে সুখেন বন্ধুকে বলল "শুভু তুই তো নিরামিষই থেকে গেলি। তোর ঐ রঙ করা ঝাঁঝালো সোডা ছেড়ে একপাত্তর বীয়ার খা। তবে জমবে।" প্রদীপ ও সুলোচনা সায় দিয়ে বলল "হক্‌কথা সুখেন দা।"

শুভেন্দু "দেখ তোর ঐ চিরতার জলের মতো তেঁতো পানীয় খেতে কি ভালো লাগে জানে না বাপু। তবে এখন অবধি মদের সাথে প্রায় ডজন খানেক মারাত্মক রোগের যোগাযোগ আছে জানা গেছে। আমাদের ভারতীয় সভ্যতায় আগে মদ খাওয়ার চল ছিল। কিন্তু শরীরের পক্ষে ক্ষতিকারক জেনে আমাদের পূর্বপুরুষেরা ওটিকে বর্জন করেছিলেন। কয়েক হাজার বছরের অভিজ্ঞতাকে বাতিল করার কোনও যুক্তি দেখিনা আমি। তবে তোরা তো এই পাতি ভারতীয়র কথা শুনবি না। সাহেবরা যখন বলবে তখন শুনবি।"

সুলোচনা "আচ্ছা শুভদা তোমরা দুজনের কেউই তো মদ খাওনা। তাতে অফিসে বা পাড়াতে নেমতন্ন গেলে তোমাদের অসুবিধা হয় না?"

"আদপেই না। আমাদের অফিসে জনা তিনেক শ্বেতাঙ্গ আছে যারা মদ খায় না। পাড়ায় কেউ ডাকলে প্রথম প্রথম বলতে হয়েছিল আমরা মদ খাইনা। এরা জোরাজুরি করে না এ ব্যাপারে, বিশেষ করে আজকাল তো অনেক নেমতন্নে মদবর্জিত পানীয় দেওয়া হয়।

মায়া ম্যাডিসনে একটা সংস্থা আছে নাম 'পিকাডা'। পুরোটা হচ্ছে প্রিভেনসন এ্যান্ড ইন্টারভেনসন সেন্টার ফর এ্যালকোহল এ্যান্ড ড্রাস এব্যুজ। মদ সহ অন্যান্য মাদক দ্রব্য ব্যবহার কমানো বা এসবের নেশার হাত থেকে লোকদের উদ্ধার করাই এই সংস্থার কাজ। মদ খাওয়ার অপকারিতা এদেশে আজকাল অনেকেই বুঝতে শুরু করেছেন। আজকাল এদেশে মদ খাওয়ার বিরোধিতা অনেকেই করছেন। এখন সিগারেট খাওয়া যেমন নিন্দনীয়। মনে হয় কিছুদিন পরে মদ খাওয়াও সেরকম নিন্দনীয় হবে। তবে মদ খাওয়া তো এদেশের ধর্ম এবং সংস্কৃতির সাথে জড়ানো। ফলে মদ বিরোধী আন্দোলন দানা বাঁধতে সময় লাগবে।"

নির্মলা মায়াকে সায় দিয়ে বলল "ঠিকই বলেছ। তবে সাহেবরা যখন বলবে তখন হয়ত আমাদের টনক নড়বে। আমরা মদ খাই জাতে উঠব বলে। মদ খাওয়া এখন আভিজাত্যের লক্ষণ। এদের কাছে তো তা নয়। কেউ চা না খেলে আমরা যেমন তাকে গেঁইয়া বলে ভাবি না, তেমন এরাও কেউ মদ না খেলে তাকে গেঁইয়া বলে ভাবে না। আজকাল তো এদেশের সব পার্টিতেই মদের বিকল্প হিসেবে ফলের রস, সোডা এসব থাকে। নকল করা যে আমাদের কবে যাবে জানি না।"

রাজেশ "আমি বিয়ের আগে মদ আর সিগারেট দুটোই খেতাম। নির্মলাই বন্ধ করিয়েছে। ভালোই হয়েছে। এখন তো মদ খেয়ে গাড়ী চালালে পুলিশে ধরলে জরিমানা করে। ফলে আগের থেকে এদেশে মদ খাওয়া অনেক কমেছে।"

শুভেন্দু—"পানীয়র ব্যাপারে এখনকার ফ্যাশন কি জান?"

অনেকেই বলে উঠল—"কি?"

"ক্যাপাচিনো কফি, অনেক জায়গায় দেখবে আমাদের দেশের চায়ের দোকানের মতো কফির দোকান হয়েছে। কফিবারে, হরেক রকমের কফি পাওয়া যায়। আগেকার মতো আর দোকানে গিয়ে এক কাপ কফি দিন তো' বললেই হবে না। হাজারটা প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে। স্বাদ কি বল, গন্ধ কি বল, সাদামাঠা না ফেনানো অর্থাৎ এসপ্রেসো কিনা এসব হাজারো প্রশ্নের জবাব দিতে হবে। এখনকার ছেলেমেয়েদের মদবিদ্যায় পারদর্শী না হলেও চলবে কিন্তু কফিবিদ্যা ঠিক মতো জানা চাই—না হলেই অচ্ছ্যুৎ।

সুখেন প্রদীপকে বলল "ওহে এত লোক মদ খাওয়ার বিরোধিতা করবে তা ত' জানাছিল না। আমরা তো দেখছি সংখ্যালঘু।"

ইতিমধ্যে মিলিবৌদি ও মিমি এসে বলল, "চলুন খাওয়ার দেওয়া হয়েছে। গরম গরম খেয়ে নিন।"

বড়রা একটা লম্বা টেবিল ঘিরে বসল। মিমি এবং অন্যান্য অল্প বয়স্করা বসার ঘরে টিভিতে একটা সিনেমা লাগিয়ে খেতে বসল।

খেতে খেতে প্রদীপ বলল "আর কিছুদিন পরে দেশে ফোন করা একটু সস্তা হবে হয়ত। দু চারটে নতুন ফোন কোম্পানি হচ্ছে।"

শুভেন্দু "মাঝে মাঝে ফোনে এমন উত্ত্যক্ত করে। ব্যাঙ্কের ক্রেডিট কার্ড বিক্রির আবেদন থেকে শুরু করে বিভিন্ন বিষয়ে সার্ভে করার প্রশ্নের জ্বালায় অস্থির। এখন তো ফোন এলে রীতিমতো আতংক হয়।"

দীপ্তি "ফোনের আতংকের কথা যদি বলেন শুভুদা তো ম্যাডিসনের সুধাদি আর বিজনদাকে দেখতে হয়। ওদের বাড়ী আমাদের বাড়ীর থেকে দু' মিনিটের হাঁটা পথ। গতমাসে পণ্ডিত রবিশঙ্করের বাজনা ছিল একদিন, আপনাদের বলেছিলাম মনে আছে? ওখানকার ভারতীয়রাই ব্যবস্থা করেছিল সব। রবিশঙ্কর বাজনার পরে সুধাদিদের বাড়ীতে খেতে এসেছিলেন। সুধাদি আমাদের এবং আরও দু' চার জন পরিচিতদের নেমতন্ন করেছিলেন। তাই ঠিক হল ওদের সাথে একসাথে সেতার শুনতে যাবো। ঘণ্টা খানেক আগেই গেলাম, সুধাদি খুব ভালো ভেজিটেবিল চপ করেন। সেসব খেয়ে আমরা গাড়ীতে চেপেছি। গাড়ীটা গ্যারেজ থেকে অর্ধেক বেরিয়েও পড়েছে এমন সময় বিমলদা হঠাৎ গাড়ী থামিয়ে ঘরের দিকে ছুটলেন। যাওয়ার সময় শুধু বললেন 'ফোন'। সুধাদিকে বললাম "এখন ফোন ধরার কি আছে। কারোর দরকার থাকলে আবার ফোন করবে। সুধাদি খুব গম্ভীর গলায় বললেন 'দেখ ফোন শুধু গল্প করার জন্য নয়। ওটা জরুরি খবর আদান প্রদান করার জন্যও বটে। ফোন না ধরলে কি করে বুঝবে কাজের ফোন না অকাজের ফোন।' আমি কথা বাড়ালাম না। ফোনে অনেকক্ষণ ধরে গল্প করার বদনাম আছে আমার। একটু পরে বিজনদা ফিরে এসে বললেন 'ভুল নম্বর'।

রবীন—'দীপ্তি তুমি ফোনের ব্যাপারে বিমলদাদের আতঙ্কের কারণটা জান না। সেটা জানলে বুঝতে বিমলদা কেন পড়িমড়ি করে ফোন ধরতে ছোটে।'

দীপ্তি "কি ব্যাপার বলুন তো? বিমলদা আর সুধাদির দু'জনেরই বাবা মা তো শুনেছি অনেক আগেই মারা গেছেন। দেশে ওদের কেউ অসুস্থ আত্মীয় আছেন নাকি?"

"এখন কেউ অসুস্থ কিনা জানিনা। তবে ঠিক সময়ে ফোন না ধরার জন্য ওদের জীবনে যা ঘটে গেছে তাতে ফোন এলেই ওরা ভীষণ ব্যস্ত হয়ে পড়েন।"

দীপ্তি বলল "বিমলদারা ম্যাডিসন এসেছেন বছর তিনেক। তার আগে গ্যারীতে থাকতেন শুনেছি। ফলে সেখানে কিছু ঘটে থাকবে হয়ত।"

রবীন "বিমলদাদের আমি চিনি দেশ থেকেই। সুধাদি আমার বড়ো দিদির বন্ধু। বড়দি আমার থেকে প্রায় বছর সাতেকের বড়। বিমলদার সাথে সুধাদির যখন বিয়ে হয় তখন আমি সবে ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে ঢুকেছি। বিমলদা বি. ই. কলেজের থেকে মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং নিয়ে পাশ করে মার্টিন বার্ন কোম্পানিতে চাকরি করতেন। ওদের বেড়াবার ভীষণ সখ, ওরা আসার পর আমরা কত জায়গায় বেড়াতে গেছি। ওসব জায়গায় যাওয়া তো দূরস্থান, নামও শুনিনি কোনওদিন।"

সুখেন "যেমন"

"যেমন প্লিমাউথ"

"বোকা বানাচ্ছ? ওটা গাড়ীর নাম। জায়গার নাম নয়।"

"শুভদা উইসকনসিনের ম্যাপটা আনুন তো। সুখেনকে দেখাই।"

শুভেন্দু "নারে রবীন ঠিকই বলছে। ও নামে একটা জায়গা আছে। হাইওয়ে তেইশের ওপর, শেবয়গানের কাছে। ওখানে একটা পুরোনোকালের হোটেল মিউজিয়ামের মতো করে রেখেছে শুনেছি।"

রবীন "আপনি জানেন দেখছি। ঐতিহাসিক হোটেল ওটা শুনেছি আগেকার কালে আন্ডার গ্রাউণ্ড রেল রোডের সাথে যুক্ত ছিল।"

সুখেন "বাওবা রবীন এক পাথরও তো পেটে পড়েনি। কোকেই নেশা করে বসে আছ। এ রাজ্যে কস্মিনকালেও পাতাল রেল ছিল না, এখনও নেই।"

রবীন বলল "সুলোচনা তুমি তো ইতিহাসের ছাত্রী। আশা করি আমি কি বলছি তুমি বুঝতে পারছ?"

"হ্যাঁ। তবে পুরোনো কালের ইতিহাসের ব্যাপার। সবার জানার কথা নয়।

রবীন "হ্যাঁ তা ঠিক। আমিও জানতাম না। বিমলদার কাছেই জেনেছি।"

রাজেশ "ব্যাপার কি রবীনদা? হামিও তো শোনেনি কখনও।"

রবীন বলল "সুলোচনা তুমিই বল।"

"এদেশে গৃহযুদ্ধের আগে ক্রীতদাসরা মালিকদের জমি ছেড়ে একপাও নড়তে

পারত না। যদি কেউ পালাবার সময় ধরা পড়ত তবে হয় তার মৃত্যুদণ্ড হত, না হয় অকথ্য অত্যাচারের ফলে প্রায় পঙ্গু হয়ে যেত, তবুও অনেক ক্রীতদাস পালাবার চেষ্টা করত। অনেকেই পালিয়ে উত্তরের দিকে চলে আসত। তাদের এই মুক্তির যাত্রায় সাহায্য করত কিছু গুপ্ত সংস্থা বা ব্যক্তি—যাদেরকে আণ্ডার গ্রাউন্ড রেল রোড বলে উল্লেখ করা হত। অনেক বাড়ী, ছোটখাট দোকান, হোটেল এই রেল রোডের সাথে যুক্ত ছিল।

শুভেন্দু "এই সময়ে সবাই একটু গলা ভিজালে হত না? মিষ্টি সোডা দিয়ে অবশ্য।"

দীপ্তি "রবীনদাকে আগে দিন, উনি অনেকক্ষণ ধরে কথা বলছেন এবং গোটা গল্প বলতে হলে তো কথাই নেই।"

সবাই কিছু পানীয় নিয়ে যে যার জায়গায় বসতেই দীপ্তি বলল, "রবীনদা শুরু করুন। আচ্ছা আপনি একদিন বলেছিলেন ওদের বিয়ের ব্যাপারটা নাকি খুব রোম্যান্টিক, সেটা শোনা হয়নি। বিমলদা অবশ্য খুব সাহেবী ধরনের লোক।"

"ভুল করলে, বাইরে থেকে তাই মনে হয়। মিশে দেখবে ভীষণভাবে ভারতীয় ভাবধারার লোক। তবে হ্যাঁ কোথাও যাওয়া আসার ব্যাপারে একবাবে ঘড়ির কাঁটা ধরে চলেন, দেখেছ তো নেমতন্ন যদি সাতটায় হয় তো বিমলদাদের আসতে বড়জোর সাতটা দশ হবে, নববর্ষ বা পুজো এরকম কোনও উৎসবের সময় ওদের দেখে একদম ঘড়ির কাঁটা মিলিয়ে নিতে পার। আমি একবার বিমলদাকে সময় নিয়ে কথাও তুলেছিলাম। বিমলদা হেসে বললেন রবীন আমরা বঙ্গপুঙ্গবরা কেন যে সময় রাখি না, তা জানি না। আমাদের পুজো, বিয়ে সব লগ্ন ধরে। লগ্নের মধ্যে বিয়ে না হলে মেয়ে লগ্নভ্রষ্টা হয়ে যায়— ব্যাপারটাতে যদিও আমার প্রবল আপত্তি। যাই হোক দেখ ললিতা সহস্রনাম বলে মহাদেবী বা মা দুর্গারও বলতে পার—এক হাজারটা নামের একটা সংকলন আছে। তাতে মহাদেবীর একটা নাম সময়াচার তৎপর অর্থাৎ যিনি সময় মেনে চলেন। অবশ্য উনি যদি সময়ের একচুলও এদিক ওদিক করেন তো গ্রহে গ্রহে ধাক্কা লেগে যাবে। সেই সংস্কৃতির লোক হয়ে আমরা কেন সময়ের ব্যাপারে এত ঢিলেঢালা তা জানিনা, দশ পনেরো মিনিট দেরী চলতে পারে, তাই বলে এক ঘণ্টা দু'ঘণ্টা? আমাদের কাছ থেকে না শেখো সাহেবদের থেকে শেখো। তবে মজা কি জান, এই বঙ্গপুঙ্গবই কিন্তু সাহেবের বাড়ী নেমতন্ন থাকলে ঘড়ি ধরে উদয় হন। তোমাদের এই ব্যাপারটা আমি বুঝি না।' একদিন ওর বাড়ীতে আমি আর মায়া বেড়াতে গেছি। ওরা দুজনে তখন পুরোনো ছবির এ্যালবাম দেখেছিলেন, অনেক জায়গায় বেড়িয়েছেন তো। ছবির এ্যালবাম প্রচুর। আমরা যেতে বললেন 'আঁটপুরে গিয়েছ কোনও দিন?' বললাম না। কোথায় সেটা বাংলার এক বিখ্যাত গ্রাম। নাম শোনোনি?' "না তো" 'বিবেকানন্দের জীবনী পড়নি?' 'হ্যাঁ, তবে উনি তো কত জায়গায় ঘুরেছেন, সব জায়গার নাম কি আর জানি।'

'নাহে, আঁটপুর উনার জীবনের এক বিশেষ ঘটনার সাথে যুক্ত, ওখানে ওঁরা সন্ন্যাস নিয়েছিলেন।'

'কেন রামকৃষ্ণ তো উনাদের গেরুয়া বস্ত্র দিয়েছিলেন কাশীপুরেই, তাই না?"

'কিছুটা জ্ঞান দেখছি, উনি কাশীপুরে থাকার সময় ওদের গেরুয়া দেন, মাধুকরীও করতে পাঠান, কিন্তু যাকে বলে প্রথাগতভাবে উনারা সন্ন্যাস নেন আঁটপুরে, ওখানে রামকৃষ্ণের অন্য এক শিষ্য বাবুরাম মহারাজ, যিনি পরে প্রেমানন্দ নাম নেন, তাঁর বাড়ী দিল। উনারা ওখানকার জমিদার ছিলেন। এছাড়া আঁটপুরে একটা বহু বছরের—বোধহয় তিনশো বছরের পুরোনো আটচালা আছে। একটা কালীমন্দিরও আছে, তাতে পোড়ামাটির ভাস্কর্য্য আছে। আঁটপুরের মাখা সন্দেশও বিখ্যাত। আমি আর সুধা তো মাখা সন্দেশ মুড়ি এসব দিয়েই দুপুরের খাওয়া সেরেছিলাম।'

'আঁটপুরে কি করে যেতে হয়?'

'আগে তো মার্টিন রেলের একটা ষ্টেশন ছিল। এখন বোধহয় হাওড়া-আমতা বাসরুটের ওপর কোথাও ঠিক জানিনা।'

ফলে বুঝছ দীপ্তি ওরা বাইরে সাহেব মানে খুব টিপটপ, সময় মেনে চলেন কিন্তু আসলে ভারতীয় ভাবধারার বাহক বলতে পার। পণ্ডিত রবিশংকর ওর বাড়ীতে এমনি আসেন নি, বিমলদার সাথে উনার বহুদিনের পরিচয়, ওরা দুজনেই উচাঙ্গ সংগীতের সমজদার। দীপ্তি—"ঠিকই বাইরে থেকে বোঝা যায় না, ওদের বিয়ের ব্যাপারটা কি বলুন তো।" "ও সে এক মজার গল্প। ইঞ্জিনীয়ারিং কলেজে বিমলদার বন্ধু ছিলেন আমাদের পাড়ার মনোজদা, আমাদের বাড়ী ব্যারাকপুরে ;বিমলদা একবার ছুটিতে মনোজদার সাথে বেড়াতে এসেছিলেন, উদ্দেশ্য গান্ধীঘাট দেখবেন। মনোজদার পরিবারের আর আমাদের বাড়ীর সবাই মিলে গান্ধীঘাট যাওয়া হোল, দিদির বন্ধু হিসেবে সুধাদিও দলে ছিলেন। আমি তখন ছোট, তবে এটুকু মনে আছে বিমলদা গল্প করে সবাইকে হাসিয়ে ছিলেন। সুধাদির বিমলদাকে খুব মনে ধরল, তবে মনের রঙ মনেই থেকে গেল কারণ যুগটা অন্য ছিল। বিমলদা অবশ্য কিছুই জানলেন না, সুধাদিও কাউকে কিছু বলেন নি। বিমলদা পাশ করে চাকরি শুরু করলেন। বিমলদা খড়্গপুরে কাকার বাড়ীতে মানুষ। বিমলদার বাবা মা মারা গেছেন যখন বিমলদার বয়স তখন ছয় কি সাত। চাকরী পেতে কাকা-কাকীমা বিমলদার বিয়ের জন্য পাত্রী খোঁজা শুরু করলেন। বিমলদা বললেন আমার বিয়ে করার প্রথম শর্ত আমি মেয়ে দেখতে যাবো না। ও আমার পোষাবে না। দুই, কানাকড়ি পণ নিতে পারবে না। বিয়ের খরচ যতদিন না জমছে ততদিন আমি বিয়ের পিঁড়িতে বসব না। তিন, মেয়ে যেন বেড়াতে ভালোবাসে, ঘরকুনো হলে মুশকিল, কারণ আমি বেড়াতে ভীষণ ভালোবাসি। মেয়ে গান জানলে ভালো না হলে অন্ততঃ গান ভালোবাসে এমন যেন হয়,' পাকে চক্রে বিমলদার কাকার সাথে সুধাদির বাবার দেখা হল তারকেশ্বরের শিব মন্দিরে, ওরা দু'জনে

কলেজে পড়ার সময় কলকাতায় একই মেসে থাকতেন। কথায় কথায় প্রকাশ পেল যে একজন সুপাত্রের সন্ধান করছেন আর অন্যজন সুপাত্রীর। পাত্র পাত্রীর ছবির আদান-প্রদান হল ; পাত্রী, পাত্রের ছবি দেখে মনে মনে গেয়ে উঠলেন 'ছবি তুমি কি শুধুই ছবি—'। পাত্র, পাত্রীর ছবি দেখে বললেন 'মন্দ নয়' কিন্তু বিশেষ কেউ বলে মনে করলেন না, বিয়ের ঠিক আগে সুধাদি মনের গোপন কথা বড়দিকে বললেন। বিয়ের দিন সুধাদিকে হাসিখুশি দেখে সুধাদির মামীমা বললেন, "তোর আমাদের জন্য মনখারাপ হচ্ছে না? আশ্চর্য্য। লোকটা কেমন তাও তো ঠিকমত জানিস না'। আমিও ছিলাম সেখানে। বড়দি বলল 'দেখুন আগে থেকে চেনে বোধহয়। মামী বললেন "ওমা! তাই নাকি?" দিদি কথা ঘোরাতে বললেন 'না মানে, আগের জন্ম থেকে চেনে, তাই বলছিলাম আরকি'।

"তাই বল্, তবে বাপু এযুগের মেয়েদের মতিগতি আমি বুঝি না" শুভদৃষ্টির আগে পর্যন্ত মনোজদাকে বরযাত্রীর কাছে যেতে দেওয়া হয়নি, বিমলদা সুধাদিকে চিনতে পারে কিনা তা বোঝবার জন্য। বিয়ে হয়েছিল কলকাতার ভবানীপুরে, সুধাদির এক মাসীর বাড়ী থেকে। ফলে বিমলদাও কিছু আঁচ করতে পারেন নি। শুভদৃষ্টির সময় বিমলদা সুধাদিকে দেখে মনে হল একটুক্ষণ কি ভাবলেন তারপরেই একটু মুচকি হাসি হাসতেই আশেপাশে অনেকে চেঁচিয়ে উঠল 'চিনেছে চিনেছে'। তারপর মনোজদা সামনে আসতেই বিমলদার যেটুকু সন্দেহ ছিল তাও কেটে গেল।

বিমলদা আর সুধাদি দুজনেই বেড়াতে ভালোবাসেন। যেখানে বেড়াতে যান সেখানকার খুঁটিনাটি বিষয় জেনে নেন আগে থেকে। বিয়ের বছরই কাকা, কাকীমা শ্বশুর শাশুড়ীকে নিয়ে কেদারবদ্রী ঘুরতে গিয়েছিলেন। বিমলদার বাবা মা তো ছোটবেলাই মারা গেছেন। ওদের আমেরিকা আসার সূত্রপাত কন্যাকুমারীতে বেড়াতে গিয়ে। সেবার ডিসেম্বরে ওরা গিয়েছেন কন্যাকুমারী। বিমলদার ইচ্ছে বিবেকানন্দ শিলা থেকে সূর্যাস্তের ছবি তুলবেন। শিলায় মন্দির হয়নি তখনও। নৌকায় করে দুজনে বিবেকানন্দ শিলায় তো পৌঁছলেন, তখনও সূর্য অস্ত যায়নি, তবে দিগন্ত বিস্তৃত সমুদ্রকে সূর্য ছুঁয়ে ফেলেছে। বাচ্চা ছেলে জলে নামে যেমন একটু একটু করে, একপা ফেলে আবার তুলে নেয়; ঠিক তেমনি ঢেউএর ওপর সূর্যকে দেখে মনে হচ্ছে একবার জল ছুঁয়ে আবার ভেসে উঠছে। সূর্যের আভায় পশ্চিম দিগন্ত রাঙা হয়ে গেছে। সূর্যের ছটায় ঢেউগুলো চিক্‌চিক্ করছে। একটা জাহাজ পশ্চিম দিকে এগিয়ে যাচ্ছিল, দেখে মনে হচ্ছিল জাহাজটা যেন সূর্যপুরীতে নোঙর ফেলতে চলেছে। সুন্দর দৃশ্য দেখে দুজনেই মুগ্ধ, সুধাদি আস্তে আস্তে সূর্য প্রণাম স্তোত্র 'জবাকুসুম সংঙ্কাশং' বলতে লাগলেন, বিমলদাও গলা মেলালেন তাতে। সূর্য যখন প্রায় ডুবুডুবু তখন হঠাৎ সুধাদির ছবি তোলার কথা খেয়াল হল 'এই ছবি তোল, সূর্য তো ডুবেই গেল'।

দু' একটা ছবি তুলে বিমলদা বললেন ক্যামেরা আর কতটুকু ছবি তুলবে বল? এসব ছবি মনের কোণে তুলে রাখতে হয়, "সত্যি কথা", বেশ কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে

সুধাদি বলল 'আচ্ছা এই সূর্য তো পৃথিবীর অন্যকোথাও উদয় হচ্ছে।' 'হ্যাঁ আমেরিকায় এখন সকাল হতে চলেছে।'

মাঝির ডাকে ওদের সম্বিত ফিরল। ডিঙিতে ফিরতে ফিরতে বিমলদা বললেন 'জায়গাটা খুবই সুন্দর তাই না, তার ওপর পুণ্যভূমি। পুরাণে আছে দেবী 'কন্যা' এই শিলায় বসে শিবের তপস্যা করেন। ভারতের মূল ভূখণ্ডে ঐ যে মন্দির, ওটা সেই দেবীর অর্থাৎ কন্যাকুমারীর মন্দির। আমরা এই শিলায় নৌকা করে এসেছি। আর বিবেকানন্দ এসেছিলেন সাঁতার কেটে। এখানে তিনরাত ধ্যান করে কাটিয়েছিলেন উনি।

'তিন-রাত। এখানে তো ছাউনীও ফেলা যাবে না।'

'না আকাশই ওর ছাউনী ছিল, তিনদিন খুব একটা কিছু খানও নি উনি।'

'সেই সময়েই তো ধ্যান করতে করতে দেখেছিলেন যে রামকৃষ্ণ ওঁকে সমুদ্রের ওপার থেকে হাতছানি দিয়ে ডাকছেন, তাই না?' 'না না এখানে ধ্যান করতে করতে উনি বিদেশ যাওয়ার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেন, প্রায় মাস চার পরে মাদ্রাজের কিছু অনুরক্ত ভক্ত ওঁকে চিকাগো যেতে অনুরোধ করেন, সেই সময় একদিন উনি স্বপ্নে দেখেন রামকৃষ্ণ সমুদ্রের ওপর দিয়ে পশ্চিমে হেঁটে চলেছেন আর ওকে হাতছানি দিয়ে বলছেন অনুসরণ করতে, স্বপ্ন দেখে উনি চিকাগো যাওয়ার জন্য মনস্থির করলেন এবং সারদা দেবীকে চিঠি লিখলেন যাওয়ার অনুমতি চেয়ে। সারদা দেবী অনুমতি না দিলে উনি হয়ত আমেরিকায় যেতেন না। চিন্তা করে দেখ সুধা, সারদা দেবী কি রকম সাহসী মহিলা ছিলেন। সময়টা আঠারশ, বিরানব্বই সাল। সে যুগে কালাপানি পেরোনো ঘোরতর ধর্মবিরোধী কাজ। উনি নিজে বামুনের ঘরের বিধবা। স্বামীও ধার্মিক বলে পরিচিত। ধর্ম সম্বন্ধে ঠিক কতটা সঠিক জ্ঞান থাকলে আর কতটা দূরদৃষ্টি থাকলে এরকম সমুদ্র পেরোনো সমর্থন করা যায় তা ভেবে দেখ, বিশেষ করে তখনকার ছুঁৎমার্গী সমাজে। আসলে কি জান প্রকৃত বৈরাগ্য মানুষকে ভীষণ সাহসী করে। সে রাত্রে হোটেলে ফিরে খেতে খেতে বিমলদা হঠাৎ সুধাদিকে বললেন 'সুধা আমেরিকা যাবে', সুধাদি আকাশ থেকে পড়লেন ;বিবেকানন্দ শিলায় গিয়ে তোমার ওপর বিবেকানন্দের ভর হল নাকি গো? একি হাওড়া থেকে উলুবেড়িয়া যাওয়া, বিকেলে টিকিট কেটে ট্রেনে চাপলাম, সন্ধ্যেবেলায় কালীমন্দিরে আরতি দেখে, ল্যাংচা খেয়ে আবার রাতে হাওড়ায় ফিরে এলাম?

তা নয়, তবে স্বপ্ন থাকলে তবেই তা সফল হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। মনে মনে ইচ্ছে করতে হবে আগে, তারপর না কার্যোদ্ধারে লাগতে হবে। চেষ্টা করতে হবে, চেষ্টা করলে হতেও পারে, চেষ্টা না করলে তো কোনও কাজ হওয়ার প্রশ্নই ওঠে না।

'টিকিটের খরচই কত, ওখানে গিয়ে খাবে কি, থাকবে কোথায়?'

'আমার বন্ধু মনীষকে মনে আছে, বরযাত্রী গিয়েছিলো, ও একটা স্কলারশিপ জোগাড় করে মাস চারেক হল আমেরিকায় গেছে। আমার রেজাল্ট ওর থেকে অনেক ভালো, আমিও স্কলারশিপ পেতে পারি।'

'ও বড়লোকের ছেলে।'

'আমারও একটা বড় প্রাপ্তিযোগ আসছে, তোমার মনে নেই? ঠাকুর্দা মারা যাওয়ার আগে বাবার ভাগটা আমার নামে ব্যাঙ্কে কুড়ি বছরের জন্য জমা করে গিয়েছিলেন বলেছি না?'

এরপর স্কলারশিপের জন্য উঠে পড়ে লাগলেন বিমলদা, ওরা প্রথম আসেন ম্যাডিসনেই। ওর মেয়ে মধুমিতার বয়স তখন বছর খানেক, এদেশে এসে ওদের বেড়ানো আরও বেড়ে গেল। তবে দেশের টান ভীষণ। বিমলদার সামনে কেউ ভারতের নিন্দা করলে তাকে তুলো ধুনো করে দেন। আমি একবার এ ব্যাপারে প্রশ্ন করতে বলেছিলেন তোর মায়ের নামে কেউ নিন্দে করলে কি তুই চুপ করে শুনবি, সে যত সত্যি কথাই বলুক না কেন?' দেশের অনেককে সাহায্য করেন ওঁরা। দূরসম্পর্কের এক আত্মীয়ের মেয়েকে ডাক্তারী পড়ার খরচ দিতেন ওঁরা। একদিন ওদের বাড়ী গিয়েছি সে সময় টেলিগ্রাম এলো যে মেয়েটি পাশ করেছে, শুনে সুধাদি আর বিমলদার কি আনন্দ। সুধাদির এক বোন আছে বিশাখাদি। বিয়ে হয়েছে চন্দননগরে, বিমলদা অবশ্য একমাত্র জীবিত সন্তান, উনি যখন খুব ছোট তখন ট্রেন দুর্ঘটনায় ওর বাবা মা আর ছোটবোন মারা যায়। সুধাদির কাকার দুই ছেলে আর একমেয়ে। ওর বাবা এবং কাকা পাশাপাশি বাড়ী করেছিলেন। আমরা ছোটবেলায় জানতাম সুধাদিরা পাঁচ ভাইবোন, ওদের মধ্যে এত মিল। কাকার বড় ছেলে বরেনদা সুধাদির থেকে বড়। ছোট ছেলে নরেনদা সুধাদির থেকে ছোট। বরেনদার পরে মেয়ে বিধুমুখী, উনি সুধাদির সমবয়সী। বরেনদা রেলে চাকরী করেন, সচ্ছল অবস্থা। বিধুদির বিয়ে হয় গৌহাটিতে, বর একটা মার্চেন্ট অফিসে চাকরী করেন, ছোট নরেনদা সে হিসেবে গরীব বলতে পারো। ছোটবেলায় দেখতাম নরেনদা ব্যায়াম, ফুটবল এসব নিয়েই থাকতেন। ভালো কুস্তি করতেন শুনতাম, পড়াশুনা বোধহয় কোনও রকমে ম্যাট্রিক পাশ। কলকাতার করপোরেশনে ছোটখাট কাজ করতেন। ফুটবল খেলার সূত্রেই এই চাকরী। এই নরেনদাকে সুধাদি খুব ভালোওবাসতেন আর অনেক সাহায্যও করতেন। ওদের জীবনের ট্র্যাজেডি এই নরেনদাকে নিয়েই।"

এতক্ষণ ধরে একটানা কথা বলে রবীন একটু থামলো।

শুভেন্দু "ভাই রবীন অনেক্ষণ একাই কথা বলছ, একটু বিশ্রাম কর, সেই ফাঁকে একটু মিষ্টিমুখও করা যাক্। গল্প বেশ ভালোই বলছ।" শুভেন্দু আর প্রদীপ সবাইকে ছানার জিলিপি আর রসগোল্লা পরিবেশন করল। মিষ্টি খেতে খেতে দীপ্তি বলল "মায়াদি ছানার জিলিপি দারুণ হয়েছে।"

রবীন "রসগোল্লা কে করেছে? একদম কে সি দাশ।"

শুভেন্দু "নির্মলা করেছে।"

' শুভদা তুমি তো মাংস-টাংস রাঁধতে পার, কোনও মিষ্টি করতে পার?"

"হ্যাঁ মিষ্টির জগতে আমার নতুন সংযোজন, ঝুরো সন্দেশ।"

"সেটা কি? মাখা সন্দেশ শুনেছি, ঝুরো সন্দেশ তো শুনিনি।"

মিলি "ওর কথা বাদ দিন তো। সেদিন ছানা আর চিনি মেখে বললাম একটু নাড়াচাড়া কর, পাক হলে ডেকো। জামাকাপড়গুলো মেশিনে কাচতে দিয়ে আসি। উনুনের আঁচটা খুব কম করে দিয়ে গেলাম। ওমা এসে দেখি আঁচটা বাড়িয়ে দিয়েছে, আর কাঠের হাতা খুব ঘন ঘন নাড়ছে, ততক্ষণে ছানা প্রায় ভাজা হয়ে গেছে, একটু বাদামী রঙ ধরতে শুরু করেছে, ও পাক কি আর ছাঁচে ফেলা যায়? তখন আবার নির্মলাকে বললাম মিষ্টি করে আনতে।" শুভেন্দু "হুঁ হুঁ, শুনলে তো ঝুরো সন্দেশ আবিষ্কারের কাহিনী করা খুব সোজা, রবীন তুমিও পারবে।"

মায়া— "রক্ষে করুন শুভুদা। যে বেগুনভাজা করতেই বেগুনপোড়া করে তাকে আর সন্দেশ করতে উৎসাহী করবেন না। তাহলে ঝুরোর জায়গায় পুড়ো সন্দেশ হবে।"

সবাই হেসে উঠল। দীপ্তি বলল "সবাই সব কিছু পারে না, মায়াদি। তুমি এত ভালো গল্প বলতে পারবে? রবীনদা আপনি থামবেন না।"

"থামবার হলে অনেক আগেই থামতাম, বছর দশেক ঘর তো করছি। আমি রান্নাঘরে না ঢুকলে মায়া এত ভালো রান্না করতে শিখত না। ঠিক কিনা, তুমিই বল মায়া?"

দীপ্তি কথার মোড় ঘোরাতে বলল, "আচ্ছা রবীনদা, বিমলদাদের ঠাকুর ঘরে একজন বৃদ্ধা মহিলার ছবি দেখেছি, হাতে আঁকা। ভাবতাম বিমলদার মা বা শাশুড়ী, এখন দেখছি তা তো নয়।"

"ও, পা টান করে ছড়িয়ে বসে আছেন যিনি।"

"হ্যাঁ, বিমলদার ঠাকুমা বোধহয় নাকি?"

"একটু খেয়াল করে দেখবে ছবির তলায় লেখা 'সবার মা সারদা'।"

"মানে সারদা দেবী।"

"হ্যাঁ। ছবিটা বিমলদার শ্বশুরের আঁকা। বিয়েতে বিমলদা কিছুই নেননি তাই উনি ছবিটা বিমলদাকে দিয়েছিলেন। আমরা অনেকে ছিলাম ওখানে। ছবি দিয়ে বললেন, "মেয়েকে ছাড়া তুমি তো কিছুই নিলে না বাবা, আমার হাতে আঁকা এই ছবিটা নাও। ইনি শ্রীরামকৃষ্ণের শিষ্য শরৎমহারাজকে যেমন নিজের ছেলের মত দেখতেন আবার কুখ্যাত দুঁতে ডাকাত আমজাদকেও তেমনি ছেলের মতো দেখতেন, বলতেন, "আমি সৎ-এরও মা, অসৎ-এরও মা।" কথা বলতে বলতে নগেন জ্যেঠুর গলা ধরে এসেছিল। ওটা তাই বিমলদা সব সময় কাছে রাখেন।"

শুভেন্দু "নাও আবার শুরু কর, এখনও অবধি সবার কৌতূহল ধরে রাখতে পেরেছ কিন্তু।"

ইতিমধ্যে মিমি এবং অন্যান্য ছেলেমেয়েরা এসে হাজির হল। ওদের সিনেমা শেষ হয়ে গেছে।

মিমি, "রবীনকাকু গল্প বলছে মনে হচ্ছে, ভূতের গল্প?"

"না, বিমল জ্যেঠুর গল্প।"

"প্রথমটা একটু বল।"

"এখান থেকেই শোনো, খাপছাড়া লাগবে না। যা বলছিলাম সুধাদির খুড়তোতো ভাই নরেনদাকে সুধাদি খুব ভালো বাসতেন। উনি কাজ করতেন কলকাতা করপোরেশনে, সুধাদিরা এদেশে আসার বছর কয়েক বাদেই নরেনদার বিয়ে হয় মেখলার সাথে। একবার দেশে গিয়ে বিমলদারা কলকাতায় বালিগঞ্জে একটা ফ্লাট কেনেন, দেশে গেলে কলকাতায় ওঠার জায়গার অভাব, তাছাড়া নরেনদা ব্যারাকপুর থেকে যাতায়াত করতে অসুবিধা হত। তাই ফ্লাটটাতে নরেনদাদের থাকতে বললেন। ফ্ল্যাট দেখাশুনাও হবে, দেশে গেলে ওঠাও যাবে। তাছাড়া নরেনদা নিত্য ট্রেনে যাওয়া আসার হাত থেকেও নিস্তার পাবেন। কিছুদিন পরে খেলাধূলা ছাড়লেন নরেনদা। পঁয়ত্রিশ-ছত্রিশের পর ফুটবল খেলা মুশকিল। সংসারও বেড়েছে ততদিনে। দুই মেয়ে সুচিত্রা আর সুমিত্রা। খেলাধূলা, ব্যায়াম ছাড়াতে নরেনদার শরীর ভাঙতে লাগল। প্রথমে ডায়বেটিস ধরা পড়ল, তারপর ব্লাডপ্রেসার বাড়ল, পঞ্চাশ বছর বয়সে হঠাৎই হার্টএ্যাটাকে মারা গেলেন নরেনদা। এই মর্মান্তিক ঘটনা ঘটার মাস তিনেক আগেই বিমলদারা দেশ থেকে ঘুরে এসেছেন, তখনও নরেনদাকে ভালোই দেখে এসেছেন, খবর শুনে দু'জনেই মুষড়ে পড়লেন। খবর পাওয়ার দু'দিনের মাথায় সুধাদি দেশে গেলেন। মেখলা বৌদি আর মেয়ে দুটোর জীবন চালানোর ব্যবস্থা করে দিতে। যাওয়ার সময় বিমলদা বললেন, "এবারে ফ্ল্যাটে একটা ফোনের ব্যবস্থা করে এসো। খবরাখবর নেওয়ার সুবিধা হবে।'

'ফোন পেতে মেখলা বুড়ী হয়ে যাবে।'

'না এখন হাজার পাঁচেক টাকা দিলে ফোন তাড়াতাড়ি পাওয়া যায়।'

'সে তো ঘুঁষ, আমি ওসব পারব না ;তুমি গিয়ে কোরো।'

'না সুধা এটা ঘুঁষ নয়, এবার গিয়ে আমার বন্ধু বাথ্যি মিত্তিরের বাড়ী গিয়েছিলে মনে আছে। ও তো টেলিফোনের বড়কর্তা। ওই বলছিল, টাকাটা দিলে ফোন পাওয়ার ব্যাপারে অগ্রাধিকার দেয় ফোন কোম্পানী। আমি ওকে একটা ফোন করে দেবো তুমি গিয়ে দেখা কোরো, ফোন থাকলে অনেক সুবিধা।

তা আর বলতে। ঠিক আছে শশিবাবুর সাথে দেখা করব, নরেনের পেনশনটার একটা ব্যবস্থাও করতে হবে।'

মেখলাবৌদির বাপের বাড়ী জলপাইগুড়িতে, ভাইরাও সব থাকে দূরে দূরে। বরেনদা তখন বদলি হয়েছেন পাটনায়। কেউই কাছাকাছি নেই, সুধাদি যাওয়াতে সব দিক দিয়েই সুবিধা হল। প্রায় মাস দুই থেকে ফোনের লাইন, পেনসন এসবের ব্যবস্থা তো করলেনই উপরন্তু সুচিত্রার একটা চাকরিও জোগাড় করলেন। কসবার একটি স্কুলে সুধাদির এক

সহপাঠিনী প্রধান শিক্ষিকা ছিলেন। তাকে বলে কয়ে একটা অল্প মাইনের চাকরী জোগাড় হল। ঠিক হল সুচিত্রা চাকরী করতে করতে বি. এড. পড়বে। ফলে সংসারটা প্রায় ভেসে যাওয়ার হাত থেকে বাঁচলো। সুধাদি মাসে মাসে কিছু টাকা দেওয়ার কথা বলেছিলেন, কিন্তু সুচিত্রা এবং মেখলাবৌদি ও ব্যাপারে ভীষণ আপত্তি করায় সুধাদি নিরস্ত হলেন। এদেশে ফেরার মাস দুই পরে কলকাতার বাড়ীতে ফোন এল, ফলে খবরাখবর নেওয়ার সুবিধা হল অনেক। বছর দুই পরে বিমলদারা সপরিবারে দেশে গেলেন। বিমলদাদের মেয়ে মধুমিতা আর ছেলে অলক দু'জনেই হাই স্কুলে পড়ে তখন। ফলে গরমের সময় বেড়াতে গেলেই সুবিধা, অনেক দিন থাকা যায়। মূল উদ্দেশ্য ছিল সুচিত্রার বিয়ের ব্যবস্থা করা। বিয়ের কথা উঠতে সুচিত্রা বলল "পিসি তোমরা তো অনেক করছ। তোমাদের কথা ফেলতে আমার খুব বাধো বাধো ঠেকে। তোমরা তো জানই আমি এ পরিবারের একমাত্র উপার্জনকারী, তাছাড়া বি. এড. শেষ করতে আরও বছর দেড়েক লাগবে। সামনের বছরেই সুমির কলেজের পড়া শেষ হবে। তখন ওর বিয়ে দিয়ে দাও। আমি আরও বছর দুই তিন পরে বিয়ের কথা ভাবতে পারবো। এখন আমি সরে গেলে সুমির পড়া চালিয়ে সংসার চালানো মুশকিল হবে।"

বিমলদা সুচিত্রার কথা শুনে খুশীই হলেন। উনার মত হচ্ছে সবাই নিজের পায়ে দাঁড়াক। তার জন্য যা সাহায্যর প্রয়োজন হয় তা করতে রাজী আছেন কিন্তু অহেতুক সাহায্য করা মানে বিমলদার ভাষায় 'ভিখিরী তৈরী করা'। জীবনে বিপদ আপদ তো আসবেই। তাই বলে অসহায়ের মতো মাথা চাপড়িয়ে ভাগ্যের দোহাই দেওয়া বিমলদা পছন্দ করেন না। সুচিত্রাকে বললেন "তোর লড়াকু মনোভাব আমার খুব ভালো লেগেছে। রবীন্দ্রনাথের কবিতা মনে আছে—

'বিপদে মোরে রক্ষা করো এ নহে মোর প্রার্থনা
বিপদে আমি না যেন করি ভয়।"

মনে রাখবি আমরাও তোর সাথে আছি। নেহাৎ সামলাতে না পারলে জানাবি কিন্তু। এই দায়িত্বর বোঝা টানতে গিয়ে দু' তিনজনকে গোটা জীবন নিঃসঙ্গ থাকতে দেখেছি। ফলে বছর তিন পরে হয় তুমি নিজে না হয় আমরা টোপর পরাবার লোক যোগাড় করব, কথাটা মনে থাকে যেন।"

সুচিত্রা হেসে বলল, "আচ্ছা বাপু, সে কথাই থাকলো।"

সুমিত্রা বি. এস. সি ফাইনাল দেওয়ার মাস দুয়েকের মধ্যেই বিমলদার বন্ধুর ছেলে সুব্রতর সাথে বিয়ে হয়ে গেল। সুব্রত জামসেদপুরের টেল্‌কো হাসপাতালের ডাক্তার। পাশ করে সবে কাজে ঢুকেছে। সুমিত্রার বিয়ের মাসখানেক আগে থেকেই সুচিত্রার মাঝে মাঝে কাশি হচ্ছিল। কাশির ওষুধ খেলে কমত একটু, ব্যাপারটায় খুব একটা গুরুত্ব দেয়নি কেউ। বিয়ের পাঠ চোকার পর ডাক্তার দেখালো সুচিত্রা, ডাক্তার বললো, "কলকাতায়

শীতে সন্ধ্যের পর এত ধোঁয়া জমে, তার থেকেই কাশি হচ্ছে। কাশির ওষুধ খান। তবে সন্ধ্যের পর রাস্তায় বেরোবেন না, ঠাণ্ডা লাগাবেন না।"

কিছুদিন পরে অল্প জ্বর জ্বর শুরু হল। তবে চান করতে বা ভাত খেতে খুব একটা খারাপ লাগে না ফলে মাকেও কিছু বলেনি সুচিত্রা। দেখতে দেখতে প্রায় বছর খানেক কেটে গেল। মাঝে জ্বর একটু বেশী হওয়ায় ডাক্তার দেখালো। ডাক্তার দেখে বলল 'নিউমোনিয়া' ওষুধ খাওয়াতে জ্বর কমলো তবে একদম সারলো না, এমন সময়ে সুব্রত আর সুমিত্রা এল কলকাতায়, সুব্রতর অফিসের কাজ ছিল। সুচিত্রার অসুখ এর ব্যাপার শুনলো শাশুড়ীর কাছে। "তুমি ওকে একটু ঠিক করে বলতো, একটা ভালো ডাক্তার দেখাক্। প্রায় ৯ মাস ধরে কখনও জ্বর কখনও কাশি লেগেই আছে। তার ওপর ইদানীং দেখি সন্ধ্যেবেলায় শুয়ে থাকে। কিছু বললে বলে স্কুল করে পড়াশুনা করে ক্লান্ত লাগে।"

সুব্রত সুচিত্রাকে বলল, "দিদি আমার মনে হয় তুমি ভালো ডাক্তার দেখাও, উডল্যাণ্ড নার্সিং হোমের ডাক্তার পীযূষ চৌধুরী আমার মাষ্টার মশাই, খুব ভালো ডাক্তার, চলো ওকে দেখিয়ে নিয়ে আসি।"

"পাগল হয়েছ তুমি। ঐ নার্সিং হোমের সামনে দিয়ে গেলেও নাকি পয়সা দিতে হয়, ওখানে একটা ভিজিটই আমাদের সারা সপ্তাহের বাজার খরচ।"

"তা হোক, টাকার ব্যাপারটা আমাকে ভাবতে দাও। আমি কালই দেখাবো তোমাকে। ডঃ চৌধুরী সন্ধ্যের দিকে বাড়ীতে থাকেন, ওখানেই যাবো।"

মেখলাবৌদিও বললেন "হ্যাঁ বাবা একটু জোর কর। আজ এ ডাক্তার কাল ও ডাক্তার এই করছে। ইদানীং বুকের ওপর হাতের কাছে ব্যথা বলছে। সংসারের চিন্তা আর পয়সার চিন্তা করে ও নিজেকে দেখার আর সময় পায় না। পয়সার হিসেব করে শেষে জীবনটাই যাবে।"

পরের দিন ডাক্তার চৌধুরীর বাড়ীতে গেল ওরা তিনজন—সুব্রত, সুমিত্রা আর সুচিত্রা। ডাক্তার চৌধুরী সুচিত্রার কাছ থেকে সবশুনে, পরীক্ষা করে সুব্রতকে আলাদা করে ডেকে বললেন, "দেখ সঠিক বলতে পারছি না, তবে ব্রেস্ট ক্যান্সার হলে আশ্চর্য হব না। তবে ঘাবড়াবার কিছু নেই। আমাদের ওখানে ডাক্তার সুনীল প্রধান আছেন। ভালো অঙ্কোলজিষ্ট। ক্যান্সারের বড় বিশেষজ্ঞ, আমি এখনই ফোন করে দিচ্ছি। কালই দেখা করো। ওর পরামর্শ মতো পরীক্ষার ব্যবস্থা করাই ভালো।"

"ঠিক আছে কালই যাবো।"

পরের দিন ডাক্তার প্রধান দেখে বললেন, "ডাক্তার চৌধুরীর অনুমান ঠিক বলেই মনে হচ্ছে। এই এক্সরে, রক্তপরীক্ষা করিয়ে নাও; কালই উডল্যাণ্ডে এসে বায়পসিটাও করিয়ে নাও রিপোর্ট পেতে দিন পাঁচেক লাগবে হয়ত। সব নিয়ে আবার দেখা কর। হাসপাতালে ভর্তি করতে হতে পারে মনে হচ্ছে।"

সব শুনে সুচিত্রা একটু মুষড়ে গেল। মেখলাবৌদি তো কেঁদেই ফেললেন। সুব্রত বলল, "আমি কালই টাটা গিয়ে ছুটির একটা ব্যবস্থা করে দু' একদিনের মধ্যেই ফিরব। তুমি থাক এখানে। রিপোর্ট পেয়ে ডাক্তার কি বলে শুনে আমেরিকায় পিশোদের জানাবো। এখনই বললে অযথা উৎকণ্ঠিত হবেন।"

সুমিত্রার বিয়ের কিছুদিন আগেই সুচিত্রার সাথে দ্বিপেন বলে একটি ছেলের আলাপ হয়, সুমিত্রার এক সহকর্মীর ভাই। মানিকতলায় বাসা ভাড়া করে থাকে, একটা ব্যাঙ্কে চাকরী করে। আলাপ কিছুটা ঘনিষ্ঠতা হওয়ায় ছেলেটি সুচিত্রার মায়ের সাথে দেখা করতে চায়। সবশুনে মেখলাবৌদি বললেন, "ভালোই তো, একদিন বাড়ীতে নিয়ে আয়। আলাপও হবে ছেলে দেখাও হবে।" তবে দ্বিপেন সুচিত্রাদের বাড়ীতে আসার আগেই ওকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়।

সুব্রত কলকাতায় ফিরেই সমস্ত রিপোর্ট নিয়ে ডাক্তার প্রধানের সাথে দেখা করে। সবকিছু দেখে ডাক্তার প্রধান বললেন, "সুব্রত অবস্থা মোটেই ভালো নয়। আজই হাসপাতালে ভর্তি করো। কাল সকাল থেকেই কেমোথেরাপি করতে হবে। তবে কতদূর কি হবে জানিনা, ফুসফুসে ছড়িয়ে পড়েছে। আমি ভাই খুব একটা আশা দিতে পারছি না।"

বিকেলের মধ্যেই সুব্রত সব ব্যবস্থা করে সুচিত্রাকে হাসপাতালে ভর্তি করে দিল, দিনটা শুক্রবার। সুচিত্রা হাসপাতালেই বলল, "পিসিকে ফোন করে বল আসতে।" হাসপাতাল থেকে বাড়ী ফিরতে প্রায় সন্ধ্যে সাড়ে সাতটা বাজল। মেখলাবৌদি হাসপাতাল থেকে ফেরার পথে এত কান্নাকাটি শুরু করেছিলেন যে তাকে সামলানো মেয়ে জামাই-এর পক্ষে দুরূহ হয়ে উঠল ; উনাকে সামলে অল্প কিছু খেয়ে হঠাৎ ফোন করার কথা খেয়াল হল। তখন প্রায় রাত সাড়ে দশটা, অর্থাৎ এখানে শুক্রবার সকাল নটা। বিমলদারা তখন থাকতেন গ্যারী, ইণ্ডিয়ানাতে। সেই শুক্রবার সকালেই বিমলদারা ছুটি নিয়ে সেন্ট লুই-তে শ্যামল বসাক বলে এক বন্ধুর বাড়ীতে যাবেন ঠিক করেছিলেন। ওরা যখন গাড়ীতে উঠে ষ্টার্ট দিয়েছেন ঠিক সেই সময়ে ফোনটা বেজে উঠল, বিমলদা বলল, 'নির্ঘাৎ শ্যামল ফোন করছে। তাড়া দেওয়ার জন্য, চলো বেরিয়ে পড়া যাক্। ঘন্টা চারেক পরে তো দেখা হবেই।" শ্যামলবাবুর বাড়ীতে ঢুকতে ঢুকতে বিমলদা বললেন, "তুই অফিসে কাজ কিছুই করছিলি না, ফোনে তাগাদা মারছিলি কেবল! বেরোবার সময় তোর ফোনটা তাই আর ধরিনি।"

"হ্যাঁ কেউ ফোন ধরল না দেখে বুঝলাম তোরা বেরিয়ে পড়েছিস্।"

আসলে, যে ফোনটা না ধরেই ওরা বেরিয়ে গিয়েছিলেন সেটা সুব্রত করেছিল। বার কয়েক চেষ্টা করে কাউকে না পেয়ে হতাশ হয়ে বলল, "নাঃ বাড়ীতে কেউ নেই। হয়ত বেড়াতে গিয়েছে কোথাও, ওখানে তো সকাল নটা হবে।"

সুব্রত শুক্রবার আর শনিবার প্রায় বার কুড়ি ফোন করেও সুধাদিদের সাথে কথা

বলতে পারল না, এদিকে হাসপাতালে ছোটাছুটি তো আছেই। কেমোথেরাপিতে খুব একটা কাজ হচ্ছিল না। তাই সুচিত্রাকে প্রায় সব সময়ই অক্সিজেন দেওয়া হচ্ছিল। এছাড়া কড়া ব্যথা কমানোর ওষুধও দেওয়া হচ্ছিল, সুচিত্রা তাই প্রায় ঘুমের ঘোরেই থাকত। ঘোর কাটলেই বলত, "পিসী কোথায়? তাকে ডাকো, পিসী আসছে না কেন?' দ্বিপেন বেচারী প্রায় সারাদিনই হাসপাতালে কাটাচ্ছিল। দেখতে দেখতে কোলকাতায় সোমবার সকাল হল, সুমিত্রার ঘুম ভাঙলো সকাল আটটা নাগাদ, আগের দিন রাতে বাড়ী ফিরেছে রাত প্রায় এগারোটায়। মেখলাবৌদিকে হাসপাতাল থেকে আনা মুশকিল হয়ে পড়ছিল। ঘুম ভেঙেই সুমিত্রার প্রথমে পিসীকে ফোন করার কথা মনে পড়ল। এখানে তখন রবিবারের বিকেল, প্রায় সাড়ে ছটা বাজে। বিমলদারা কিছুক্ষণ আগে ফিরে চা খেতে বসেছেন। বাচ্চা দুটো দূরদর্শন দেখছে। ফোন বাজতেই বিমলদা ধরলেন। ওদিক থেকে সুমিত্রা খুব উত্তেজিত হয়ে বলল, 'বাব্বাঃ পিশে। তোমাদের এতদিনে পেলাম, কোথায় ছিলে? এদিকে খবর মোটেই ভালো নয়। তোমরা এখনই এস। "প্রায় এক নিঃশ্বাসে কথা কটা বলে সুমিত্রা দম নেওয়ার চেষ্টা করল। বিমলদা ব্যস্ত হয়ে জিজ্ঞেস করলেন "কি হয়েছে? হাঁপাচ্ছিস কেন? ঠিক করে বল? সুমিত্রার গলা শুনে ততক্ষণে সুব্রত উঠে এসেছে বিছানা ছেড়ে। বিমলদার গলার স্বরে চমকে উঠে সুধাদি ফোন ধরে বললেন "কি ব্যাপার কি হল?"

সুব্রত সংক্ষেপে সবকিছু বলে বলল, "তুমি যত তাড়াতাড়ি পারো রওনা হও। দিদি তোমাকে খুব দেখতে চাইছে।"

সুধাদি ভীষণ আঘাত পেলেন। গলা ফাটিয়ে বললেন "সু-ব্র-ত, তোমার মেয়েটাকে একটু সামলাও, আমি সম্ভব হলে আজই বেরোচ্ছি।"

বিমলদারা সব সময় দেশে যাওয়ার টিকিট কাটেন চিকাগোর রীণি দাশগুপ্তর কাছ থেকে। ওকে ফোন করতেই বললেন, 'একজনের টিকিট হয়ে যাবে। দুটো বা তার বেশী টিকিট পাওয়া এখন মুশকিল। আমি কাল দুপুরের মধ্যে জানাবো। তবে আপনাদের মধ্যে একজন যাওয়ার জন্য তৈরী থাকবেন। কাল সন্ধ্যের দিকে একটা প্লেন আছে। সরাসরি কলকাতা যাওয়া যাবে। টিকিট পেলে আমি এয়ারপোর্টে টিকিট নিয়ে দেখা করব। চিন্তা করবেন না। একটা টিকিট পাবো আশা করছি।"

বিমলদা সুধাদিকে বললেন "তুমিই যাও। আমি যেতে গেলে অফিসে কাজ গুছিয়ে বেরোতে অন্ততঃ দিন সাতেক সময় লাগবে।"

সুধাদি কলকাতায় ফোন করলেন আবার। সুমিত্রাই ফোন ধরল।

"সুমি আশা করছি আগামী কাল রওনা হতে পারব। তবে কাল সকালে অর্থাৎ তোদের ওখানকার সোমবার রাত ন'টা দশটায় ফোন করে বলব কখন পৌঁছাবো। সুচি এখন কেমন আছে?

"ভালো না। যাই হোক, তোমার জামাই থাকবে দমদম-এ।"

"তাহলে হাসপাতালে ছেলেদের মধ্যে কে থাকবে। দাদারা কেউ এসেছে?"

"না, কেউ আসেনি। সব্বাইকে টেলিগ্রাম করা হয়েছে। কেউ নিশ্চয় এসে যাবে এর মধ্যে। না হলে দ্বিপেনদা তো থাকবেই।"

" কে দ্বিপেন?"

একটু চুপ করে থেকে সুমিত্রা বলল, "দিদির বন্ধু।"

পরের দিন রীণি দাশগুপ্ত জানালেন টিকিট পাওয়া গিয়েছে। ঘরের কাজ, ছেলেমেয়েদের স্কুলের টিফিনে কি যাবে এসব বিমলদাকে বুঝিয়ে সুধাদি প্লেনে চাপলেন। প্লেনে সুধাদি চুপচাপ বসে থাকতে পারছিলেন না, বার বার জল কফি এসব খাচ্ছেন। উনাকে দেখে পাশের সহযাত্রী, এক গুজরাটী মহিলা ইংরাজীতে বললেন, "আপনাকে খুব চঞ্চল দেখাচ্ছে, দেশে কি কেউ অসুস্থ?"

সুধাদি উনাকে সংক্ষেপে সুচিত্রার অসুস্থতার কথা জানালেন। ভদ্রমহিলা কলকাতারই বাসিন্দা। বাংলায় বললেন, "চিন্তা করে কি করবেন? বিদেশে থাকার এই এক দুঃখ, দেখুন না আমার বাবা মারা গেছেন গত পরশু। শেষ সময়ে সামনে থাকতে পারলাম না, অথচ ছোটবেলায় বাবা কাজে কোথাও বাইরে গেলে কেঁদে ভাসিয়ে দিতাম।" উনার সাথে কথা বলে সুধাদির সময় তবুও কিছুটা ভালোই কাটল।

সুধাদি দমদমে পৌঁছলেন বুধবার দুপুরের দিকে। সুব্রত সুধাদিকে দেখে এগিয়ে এসে প্রণাম করল। সুধাদি ব্যস্তভরে বললেন, "সুচি কেমন আছে?"

"চলো সব বলছি।"

রাস্তায় ট্যাক্সিতে আসতে আসতে প্রথম থেকে কি হয়েছিল সে সবই বলতে বলতে এল। ট্যাক্সি যখন প্রায় বাড়ীর কাছে এসেছে তখন সুধাদি সুব্রতকে জিজ্ঞেস করল, "আগে বাড়ী কেন? সোজা হাসপাতালে চল। সুচিকে দেখে তারপর চান খাওয়া এসব করা যাবে।"

কথার কোনও জবাব না দিয়ে সুব্রত ট্যাক্সি চালককে কোন্ রাস্তা দিয়ে যেতে হবে তা বলতে থাকল। কয়েক মিনিটের মধ্যে ট্যাক্সি বাড়ীর সামনে এসে দাঁড়াল; সুব্রত তাড়াতাড়ি ট্যাক্সি থেকে নেমে মিটার দেখে পয়সা দিতে এগিয়ে গেল। সুমিত্রা দরজায় অপেক্ষা করছিল। ট্যাক্সি থামতেই ও ছুটে এল। সুব্রত ফিস ফিস করে সুমিত্রাকে বলল "আমি কিন্তু পিসীকে কিছু বলিনি।" সুমিত্রা পিসীকে দেখে চোখের জল ধরে রাখতে পারল না। সুধাদি বুঝতে পারলেন বড় রকমের কোনও দুঃসংবাদ আছে। 'সুচি কেমন আছে' এ প্রশ্নের উত্তরে সুমিত্রা হাউ হাউ করে কেঁদে উঠতে সুধাদি বুঝলেন উত্তরটা কি। ধীর গতিতে সিঁড়ি দিয়ে উঠতে লাগলেন। ফ্ল্যাটের দরজার কাছে আলুথালু বেশে মেখলাকে দেখে সুধাদি দৌড়ে গিয়ে মেখলা বৌদিকে জড়িয়ে ধরে কাঁদতে লাগলেন। কাঁদতে কাঁদতে

মেখলাবৌদি বলবেন "দিদি সেই এলে, একদিন আগে আসতে পারলে না? মেয়েটা তোমাকে দেখতে চাইছিল বার বার।" সুচিত্রা সেদিন ভোরেই মারা গেছে।

গল্প বলে রবীন থামল। সবাই নিঃশ্চুপ। বাইরে ঝিঁঝি পোকার ডাক শোনা যাচ্ছে। কিছুক্ষণ পরে নিঃস্তব্ধতা ভেঙে দীপ্তি বলল, "এতদিনে বুঝলাম সুধাদি কেন ফোনে দু'চার মিনিটের বেশী কথা বলে না, আর ফোন বাজলেই ও বাড়ীতে সবাই কেন ফোন ধরতে ব্যস্ত হয়ে পড়ে।

রবীন, "যদিও ঘটনাটা প্রায় বছর দশেক আগে, তবে ওরা ঐ আতঙ্ক এখনও কাটিয়ে উঠতে পারেনি।"

বানডু

আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে ঋতু বলতে চারটি— শীত, বসন্ত, গ্রীষ্ম আর শরৎ। ঋতুর নাম শীত দিয়ে শুরু করলাম কারণ দেশটা শীতপ্রধান। অবশ্য এতবড় দেশ যে পুরো দেশটা শীতপ্রধান বললে ভুল হবে। কারণ আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের দক্ষিণের প্রদেশগুলিতে— যেমন ফ্লোরিডা, টেক্সাস ইত্যাদি প্রদেশে প্রচণ্ডই গরম পড়ে, প্রায় কলকাতার মতোই। তবে উত্তর দিকটা শীতপ্রধান। ম্যাডিসন শহর আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের উত্তরের দিকের একটি প্রদেশ উইসকনসিনের রাজধানী। ম্যাডিসনে প্রচণ্ড ঠাণ্ডা পড়ে এবং বরফও পড়ে প্রচুর। শীতে ওদেশের লোকেরা জবুথুবু হয়ে বসে থাকে না। আইসস্কেটিং, স্কী ইত্যাদি খেলাধূলায় মেতে ওঠে। তবে ভারত থেকে (সদ্য) আগত প্রথম প্রজন্মের বাঙালীদের কথা আলাদা। শীত পড়ল কি, সপ্তাহান্তে খুশিভাতি আর সান্ধ্যমজলিশের ধুম পড়ে যায়। নেহাৎ প্রয়োজন ছাড়া শীতের সময় রাস্তায় বাঙালীকে খুব একটা দেখা যাবে না। তবে নেমতন্ন থাকলে তুষারঝড়ও বাঙালীকে বাড়ীতে বেঁধে রাখতে পারে না। তখন বাঙালীর বীরত্ব দেখার মতো। টানটা অবশ্য কিছুটা খাওয়ার আর বেশ কিছুটা আড্ডার। এমনিই এক শীতের রাত্রে সুশীলবাবুর— সুশীল রায়ের, ওকান্টো লেনের বাড়ীতে খুশিভাতির পরে আড্ডা জমেছে।

গল্প জমে ওঠার আগে সবার সাথে পরিচয়ের পালা সেরে ফেলা যাক্। সুশীলবাবু উইসকনসিন বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থবিদ্যার অধ্যাপক, স্ত্রী দেবীকা ব্যাঙ্কের উঁচুপদের কর্মচারী। ছেলে সুব্রত চলচ্চিত্র পরিচালনা নিয়ে পড়াশুনা করে। মেয়ে অদিতি স্কুলের পড়া শেষ করে সবে কলেজে ঢুকেছে; ইচ্ছে ডাক্তারী পড়ার। ভালো বেহালা বাজায়। অনিমেষ সামন্ত সুশীলবাবুর স্কুলের সহপাঠী, রাজ্য সরকারের পদস্থ কর্মী, স্ত্রী লক্ষ্মী— দর্শনের স্নাতক এবং এখনও ভারতীয় দর্শনের চর্চা করেন। ভালো গান গাইতে পারেন, বিশেষ করে ভক্তিগীত। উনিও রাজ্যসরকারী কর্মচারি। ওঁদের একই মেয়ে—সুদর্শনা ইতিহাসের ছাত্রী ; মিষ্টি গলা, মায়ের সাথে গাইতে পারে। বিমান পাল স্থানীয় একটি কারিগরী

পরামর্শদাতা সংস্থায় ইঞ্জিনিয়ার। স্ত্রী মেনকা একটি জামাকাপড়ের দোকানে কাজ করেন। দুই ছেলে—সুমন ও ধীমান। দু'জনেই চিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র। সুব্রত মিত্র বিশ্ববিদ্যালয়ের জীববিদ্যার গবেষক। স্ত্রী পারমিতা কম্প্যুটার সায়েন্স নিয়ে পড়াশুনা করছেন। ওঁরা বছর তিনেক হল ভারত থেকে এসেছেন। বয়সে অন্যদের থেকে অনেক ছোট। আড্ডার আসরে ছেলে মেয়েরা কেউ নেই। তারা অন্যঘরে বসে কেনেডি হত্যার ওপরে তোলা একটি ছবির ভিসি দেখছে।

বড়রা সবাই বসার ঘরে জমায়েত হয়ে একথা-সেকথার পরে সুশীলবাবু বললেন "অদিতিটা কিছুদিন ধরে কুকুর কেনার ঝোঁক ধরেছে। এরকম তুষারঝড়ের মধ্যে কে কুকুরকে বাইরে বের করবে বলতো। শেষমেষ ঝক্কি পোয়াতে হবে আমাকেই।"

অনিমেষ বলল "বাজে বকিস না সুশীল। পারদের কাঁটা তিরিশে (ফারেনহাইট স্কেলে) নামলেই তুই রাস্তায় পা দিস্ না। এরকম বরফ পড়লে তুই বেরোবি?"

দেবীকা মেয়ের দলে। বলল "যা বলেছ অনিদা, ও বেরোবে? আমাদেরই বেরোতে হবে। কুকুর বড় উপকারী জন্তু। সেই কবে থেকে কুকুর মানুষের সঙ্গী।"

লক্ষ্মী বলল, "সেই মহাভারতের যুগ থেকে।"

সুশীল বলল "হ্যাঁ তা অবশ্য ঠিক মহাপ্রস্থানের পথে যুধিষ্ঠিরের সাথে কুকুর ছিল।"

লক্ষ্মী— "পাণ্ডবদের সাথে একটা কুকুর বরাবরই থাকত বোধহয়। একলব্যের গল্প মনে আছে? একলব্য বান মেরে পাণ্ডব ও কৌরবদের পোষা কুকুরের মুখ বন্ধ করে দিয়েছিল। তবে কোনও একটি উপনিষদে কুকুরের উল্লেখ আছে।"

পারমিতা বলল "কিরকম, কুকুর কি কোনও দেবতা।"

"না, কোনও একটা উপনিষদে ধার্মিক সাদা কুকুরের উল্লেখ আছে।"

পারমিতা, "ব্যাসদেব যে পাণ্ডবদের মহাপ্রস্থানের সময় কুকুররূপী ধর্মরাজকে দেখিয়েছেন, সেটা তাহলে ঐ উপনিষদ থেকেই এসেছে?"

"সম্ভবতঃ তাই।"

সুব্রত বলল— "দেবী বৌদি তুমি ঠিকই বলেছ। কুকুর মানুষের বড় উপকারী, এদেশে দেখেছ অনেক অন্ধ সাথে বড় কুকুর রাখে। ওরা মালিককে রাস্তায় হাঁটতে সাহায্য করে। এমনকি গাড়ী ঘোড়া দেখে রাস্তা পারও করায়। কাউরির সাহায্যের দরকার হয় না। ঐ কুকুরগুলোকে নিয়ে বাসেও উঠতে দেয় অন্ধদের।"

সুব্রত কথা শেষ করতেই অনিমেষ বলল "কুকুরের বুদ্ধিও খুব, আমার মামার কুকুরের খুব শখ ছিল। আমরা তখন ছোট। মামা রেলে কাজ করতেন। একবার পুজোয় মামার বাড়ীতে গিয়েছে। উনি তখন মধ্যপ্রদেশের নয়নপুরে থাকতেন। রেলের বিরাট বাড়ী। অনেক বড় বাগান, বাড়ীতে ঢুকে দেখি তিনটে কুকুর। বিশাল এক এলসেসিয়ান। মামা

বলল—ও এখনও ছোট, আরও বাড়বে।" প্রায় দু' ফুট উঁচু, তিন ফুট লম্বা কুকুর যদি ছোট হয় ত' বড় হলে উনি কি হবেন কে জানে। দেখেই তো আমার ভয়ে আত্মারাম খাঁচাছাড়া, নাম আবার লাইনু। বাড়লে ছোটখাট সিংহই হবে সন্দেহ নেই। আর একটা ছোট ড্যাশ্যান্ত না কি যেন জাতের, উচ্চতা ন' ইঞ্চি মতো লম্বায় দেড় ফুট। নাম গুড়িয়া ; সে বেটা গুড় গুড় করে ছুটে বেড়ায়। আর একটা ছোট লোমশ ল্যাপ ডগ, নাম কমলী। গুড়িয়া আর কমলী মামীর আদুরে কুকুর। লাইনুকে মামীর খুব একটা পছন্দ হয় না। আমি একটা ছোট খাটে বসতেই গুড়িয়া আর কমলী তড়াক করে খাটে উঠে জিব দিয়ে এমন হাত, পা গা চাঠা শুরু করল যে আদরের চোটে প্রাণ যায়। মামাতো বোন নয়না ডাকতে নেমে গেলো।

নয়না বলল 'দাদা ভয় পাস্না। ওরা কামড়ায় না, তোর সাথে খেলছে। তবে লাইনুটা নতুন লোক দেখলে দিন কয়েক দেখে বুঝে তবে বন্ধুত্ব করবে।

মামার বাড়ীর ঘরের সামনে আর পেছনে লম্বা বারান্দা, এক ঘর থেকে অন্য ঘরে বারান্দা দিয়েই যাতায়াত করতে হয়। পেছনের দিকের বারান্দার পরে উঠোন, উঠোনের একদিকে রান্না ঘর, পেছনের বারান্দার একদিকে একটা ছোট ঘর। দুপুরে খাওয়ার পর দেখি ছোট ঘরটার ছাদে দড়ি লাগিয়ে একটা হাড়ের টুকরো ঝুলাচ্ছে নগেন, মামার বাড়ীতে কাজ করে।

মামাকে জিজ্ঞেস করলাম "ওটা কি মামা।

"মামা বিজ্ঞের হাসি হেসে বললেন "লাইনুর ব্যায়ামের জন্য। ওকে ঐ ঘরে ঢুকিয়ে বন্ধ করে দেবো। ও মাংস দেখে লাফিয়ে খেতে চেষ্টা করবে। তাতে করে লম্বাও হবে, ব্যায়ামও হবে।"

হলও তাই। লাইনু ঘরে ঢুকেই ওপরে তাকিয়ে দেখল হাড় ঝুলছে, দেখেই লম্ফ-ঝম্ফ শুরু করে দিল। ঘন্টা খানেক চেষ্টা করে ক্লান্ত হয়ে বেচারা শুয়ে পড়ল। এত হাঁফিয়ে গিয়েছিল যে জিব প্রায় একহাত বেরিয়ে পড়েছিল।

মামা বলল "দেখলি, এসব বই পড়ে শিখতে হয়, এ্যালসেসিয়ানের বুদ্ধি মানুষের মতো। ঠিক মতো শেখাতে পারলে যা হবে না।"

আমরা ছোটরা তো আলোচনা করছি লাইনু বড় হয়ে কি রকম বুদ্ধিমান হবে। মামাতো ভাই পিন্টু বলল "জানিস অনিও এখন লাঠি ছুড়ে দিলে আনতে পারে। এখনও অবশ্য লাঠি ফেরৎ দিতে চায় না। অনেক টানাহ্যাঁচড়া করতে হয় লাঠি মুখ থেকে বের করতে, বাবা অবশ্য বলেছে মাস দুয়েকের মধ্যেই লাঠি ফেরৎ দিতে শিখে যাবে।"

ওদিকে লাইনুর মধ্যাহ্ন ব্যায়াম চলছে পুরোদমে। বিকেলে লাইনুকে ছোট ঘর থেকে বের করে হাড়টা দড়ি থেকে খুলে খেতে দেওয়া হয়। হাড় নিয়ে এক দৌড়ে লাইনু বাগানে ঝোপের আড়ালে চলে যায়। জমিয়ে হাড় চেবাবে বলে। গুড়িয়া আর কমলী দু একদিন লাইনুর পেছন পেছন হাড়ের লোভে গিয়েছিল, সিংহের মতো ঘড়ঘড়ানি শোনার

পরে ভয়ে আর ওদিকে যায় না। দিন সাতেক চলল এরকম কসরৎ আর বিকেলে হাড় নিয়ে ছুটে ঝোপে লোকানো। একদিন দেখলাম লাইনু ঘরে ঢুকে একবার ওপরে তাকিয়ে দেখে নিল হাড় আছে কিনা। তারপর নীচে টানটান হয়ে শুয়ে পড়ল, হাড়ের জন্য লাফালাফি করল না। লাইনুর হাবভাবে মামা একটু চিন্তিত হলেন, বললেন "রোজ লাফিয়ে গায়ে ব্যথা হয়েছে বোধহয়। তাই একটু বিশ্রাম নিচ্ছে।"

দিন দুই পরেও লাইনুর ব্যবহার পাল্টালো না। তবে বিকেলে হাড় পেলেই দৌড়ে ঝোপে লোকানো বন্ধ হল না। আসলে ও ততদিনে বুঝে গেছে যে হাড়টা বিকেলে ওরই প্রাপ্য। শুধু শুধু লাফালাফি করে শক্তিক্ষয় করা কেন। তাই ঘরে ঢুকেই আগে ওপরের দিকে তাকিয়ে দেখে নিত হাড়টা আছে কিনা। নিঃসন্দেহে বুদ্ধিমানের মতোই কাজ। কি বল?"

অনিমেষের গল্প শুনে অনেকেই ফিক্‌ফিক্ করে হাসতে লাগল। হাসতে হাসতে লক্ষ্মী বলল "মামার কুকুর বাতিক নিয়ে যে কত গল্প আছে।"

দেবীকা বলল "কুকুরের বুদ্ধির গল্প কত আছে, তবে কিছুদিন আগে একটা কুকুরের যা বুদ্ধি দেখলাম, সেরকম কখনও দেখিনি বা শুনিনি।"

সুব্রত বলল "সারকাসে তা? ওসব ট্রেনিং দিয়ে করায়।"

সুশীল বলল, "না হে সারকাসে নয়, এই আমাদের পাড়াতেই তোমার বৌদির মুখে শোনো গল্পটা, গল্পই বা বলি কেন, এটা ঘটনা, এই গরমেই ঘটেছে এটা, দেবী বলো না ঘটনাটা।

দেবী শুরু করল, "আমাদের দু'জনেরই বাগান করার সখ আছে তা তো জানই। ও তরিতরকারির গাছ লাগায় আর আমি ফুলের। শনিবার সকাল দশটা নাগাদ পুজো আচ্চা করে, জলখাওয়ার সেরেই বেরিয়ে পড়ি বাগান করতে। মে মাসের শেষ শনিবার সেটা। জোহান্‌সনের ফুলের চারা খুব ভালো। শুক্রবার অফিস ফেরতা পিটুনিয়া, গাঁদা, ইমপেশেন্ট, ইত্যাদি সব মিলিয়ে প্রায় তিন চার ডজন ফুলের চারা আর বেশ কিছু টমাটো, লঙ্কা, বেগুন এসবের চারা নিয়ে এসেছিলাম। দশটা নাগাদ বেরিয়ে দু'জনে চারাগুলো লাগাচ্ছিলাম; অদিতিও আমাদের সাথে কাজ করছিল। ও সময় অনেকটা বাচ্চা ছোট সাইকেল চালায়, খেলা করে। তাদের বাবা মাও থাকে সাথে। প্রতিবেশীদের মধ্যে কেউ হয়ত দাঁড়িয়ে একটু গল্প করল। আমাদের ডানদিকে যে বয়স্ক ভদ্রলোক থাকেন, নাম জন। সে আবার আগে ফুলের দোকানে কাজ করতেন, সত্তর-বাহাত্তর বছর বয়স, বিপত্নীক। আমাদের গাছ লাগাতে বা বাইরে কাজ করতে দেখলেই ভদ্রলোক আসেন। কি করলে গাছের ফুল বড় হয়, মাটি কিভাবে তৈরী করলে ভালো এসব নিয়ে কথা বলেন। যাই হোক ঐ ভদ্রলোক এসেছেন, কথা হচ্ছে। এমন সময় দেখি একটা ছয় কি সাত বছরের বাচ্চা ফুটপাতের ওপর দিয়ে সাইকেল চালিয়ে আসছে, সিগো রোড ধরে, রিজেন্ট স্ট্রীটের দিক থেকে। পেছনে মিশমিশে

কালো একটা কুকুর আর তার পেছনে পেছনে এক ভদ্রলোক একটু জোরে হেঁটে আসছেন। পরে অবশ্য জেনেছিলাম ভদ্রলোক ওর বাবা। আমাদের বাড়ীব কাছাকাছি আসতেই হঠাৎ কুকুরটা কি রকম কুঁইকুঁই আওয়াজ করে ছেলেটার পাশে এসে লাফিয়ে উঠতে লাগল। বার দুই তিন এরকম লাফাতে ছেলেটা তো সাইকেল থেকে নেমে পড়ল। ছেলেটির বাবা ছুটতে ছুটতে এসে ছেলেকে বলল, "চল চল বাড়ী চল।"

আমাকে সামনে দেখে বললেন "কিছু যদি মনে না করেন, সাইকেলটা আপনার গ্যারাজে রেখে দেবেন কি? পরে এসে নিয়ে যাবো। আমরা ঐ সামনের ওয়াকেশা রোডে থাকি।" বললাম— "হ্যাঁ, নিশ্চয়ই।" ভদ্রলোক তাড়াহুড়ো করে সাইকলটা গ্যারাজের একপাশে রেখে, ছেলেকে কোলে নিয়ে বাড়ীর দিকে ছুটলেন। আমি আর অদিতি ব্যাপারটা ঠিক বুঝতে না পেরে এ ওর মুখের দিকে অবাক হয়ে তাকালাম, জনও ব্যাপারটা কিছু বুঝল না। আমার কর্তা বলল, "নিশ্চয় কোনও অসুখ বিসুখ আছে।"

আমরা ঘন্টাখানেক পরে বাজার করতে বেরোলাম। অদিতি বেরিয়ে গেল টেনিস খেলতে। সুব্রত তো সকাল থেকেই বেরিয়ে গেছে লাইব্রেরীতে পড়াশুনা করতে। অদিতিকে নিয়ে আমরা ফিরলাম প্রায় তিনটে নাগাদ। বাড়ী ফিরে অদিতি চিঠির বাক্স থেকে চিঠিপত্রগুলো নিয়ে এল। আমাদের ডাক দেয় সাড়ে বারোটা নাগাদ। চিঠি পত্রের সাথে দেখলাম একটা সাদা খাম। খাম খুলে দেখি একটা ছোট্ট চিঠি। বুঝলাম ঐ ভদ্রলোক লিখেছেন। ওদের বাড়ীর ফোন নাম্বার দিয়ে অনুরোধ করেছেন বাড়ী ফিরে আমরা যেন ফোন করি। উনি এসে সাইকেলটা নিয়ে যাবেন। সাহায্য করার ধন্যবাদ ইত্যাদি। ফোন করতেই ভদ্রলোক বললেন, 'এখুনি আসছি।' এসে তো আমাদের অনেক ধন্যবাদ দিয়ে সাইকেল নিয়ে গেলেন।

যাওয়ার সময় আমি জিজ্ঞেস করলাম, "ছেলে ভালো আছে, হঠাৎ করে ওকে ওভাবে নিয়ে গেলেন, বললেন "হ্যাঁ, ওর মৃগী রোগ আছে। তাই অজ্ঞান হওয়ার আগেই তাড়াতাড়ি নিয়ে গেলাম।'

'বুঝলেন কি করে?'

'ঐ যে বানডু আমাদের কুকুরটা সংকেত দিল।'

'কুকুর কি করে বুঝল যে ও অজ্ঞান হয়ে যাবে।'

'ও বুঝতে পারে, অজ্ঞান হওয়ার আধ ঘন্টা চল্লিশ মিনিট আগেই বুঝতে পারে।'

'আচ্ছা? খুব আশ্চর্য তো।'

'আপনারা আসুন না কালকে বিকেলে, আমাদের বাড়ী কাছেই তো থাকি। তখন গল্প করব। আপনারা ভারতীয় মনে হয়।'

'হ্যাঁ ঠিক বলেছেন।'

'আমরা এর আগে সানফ্রানসিসকোতে ছিলাম। আমাদের পাশের বাড়ীতে মিত্র

নামে এক ভারতীয় পরিবার ছিল। আমরা দু'জনেই ভারতীয় খাওয়ার খেতে ভালোবাসি। জ্যানেট, "আমার স্ত্রী সিঙ্গারাও করতে জানে।

'তাই নাকি? তাহলে তো খেতেই হবে।'

'ভালোই হল আলাপ হয়ে। আমাদের বাড়ীর নম্বর হচ্ছে চার হাজার চারশো চুয়াল্লিশ। সামনে আপনাদের মতোই বাগান আছে। অবশ্য এত ভালো বা বড় নয়'।

ভদ্রলোক তো বিদায় নিলেন। অদিতি শুনে বলল, "ও বুঝেছি স্কুলের ঐ পাশটায় বাড়ীটা। তোমার মনে নেই মা, তিনচার দিন আগে হাঁটতে গিয়েছিলাম ওদিকটায়, অনেক টিউলিপ আর ডাফোডিল আছে?'

"হ্যাঁ হ্যাঁ মনে পড়েছে। বাড়ীর নম্বরটাও অদ্ভুত, চার চার চার চার।"

পরের দিন বিকেল তিনটে নাগাদ, গেলাম ওদের বাড়ীতে। একটা ফ্রুট কেক করে নিয়ে গিয়েছিলাম। অদিতিও সাথে গেল। কুকুর কি ভাবে মৃগী রোগ বুঝতে পারে সেটা জানার জন্য। ভদ্রলোকের নাম ফিলিপ হুইট, একই ছেলে নাম গর্ডন। ফিল বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাসের অধ্যাপক। স্ত্রী জ্যানেট ভ্যান হাইস স্কুলের শিক্ষিকা, স্কুলের পাশেই তাই বাড়ীটা কিনেছে। গর্ডনের মৃগী রোগ ধরা পড়ে ও যখন বছর চারেকের। ডাক্তার কড়া ওষুধ দিতে চায় নি। তাই ছেলেকে ওরা চোখে চোখে রাখে। ওরা এক বন্ধুর কাছে শুনেছিল যে এক ধরনের কুকুর আছে যারা মৃগীরোগী অজ্ঞান হওয়ার আগে জানতে পারে, অনেক খোঁজ খবর করে পেনসিলভেনিয়ার কোকরানভিল বলে একটা শহরে একটা সংস্থার খোঁজ পেল যারা অন্ধ বা মৃগী রোগীদের সাহায্য করার মতো কুকুরদের শিক্ষা দেয়। সেখানে খবর নিয়ে জানল যে একটা দোআঁশলা ল্যাব্রাডর জাতের কুকুর ওদের কাছে আছে যা গর্ডনকে সাহায্য করতে পারে। সেখানে ওরা সপরিবারে বার দুয়েক গিয়ে বানডুকে পরীক্ষা করে দেখল। বানডুর আগে অন্য কি একটা নাম ছিল, মাস দুয়েক বয়সে বানডুর পা ভেঙে যাওয়াতে ওর মালিক এক পশুপ্রেমীকে নিয়োগ করে পা সারাবার জন্য। সেখানে যে নার্স ছিল সে বানডুকে দেখে বুঝতে পারে যে এ ভালো জাতের কুকুর, তখন সেই নার্স তার এক বন্ধু যে কোকরানভিলের শিক্ষা সংস্থায় কাজ করত তাকে বলে বানডুর কাহিনী। সেই বন্ধু তখন বানডুকে নিয়ে চিকিৎসা করিয়ে পা ঠিক করে ট্রেনিং দেওয়ার ব্যবস্থা করে। এসব কুকুরকে ট্রেনিং দেওয়া নাকি খুব ঝামেলা। এরা ভীষণ চঞ্চল আর চালাক হয়। যাই হোক বানডুকে নিয়ে প্রথম প্রথম একটু অসুবিধা হয়েছিল কারণ নতুন মালিক তো। এখন বানডু সব সময় গর্ডনের কাছাকাছি থাকে। স্কুলেও যায়। ক্লাসে গর্ডনের পাশে চুপ করে বসে থাকে বানডু। সাধারণত এ ধরনের অন্য কুকুর দশ পনেরো মিনিট আগে বুঝতে পারে মালিক অজ্ঞান হতে চলেছে। তবে বানডু তিরিশ চল্লিশ মিনিট আগে থেকে গর্ডনকে সাবধান করে দেয়। কুঁই কুঁই করে আওয়াজ করে, গাল চাটতে শুরু

করে। গর্ডন বসে থাকলে কাছাকাছি কোনও বিছানায় শুয়ে পড়ে। স্কুলেও ওর একটা বিছানা রাখা আছে।

দেবীকা থামতে পারমিতা জিজ্ঞেস করল, "বৌদি কুকুরটা বোঝে কি করে?"

"ঠিক মতো কেউ জানে না। তবে অনেকে মনে করে গন্ধ পায় ওরা। কিন্তু রোগটা তো মাথায় একটা এলোমেলো তড়িৎ প্রবাহ থেকে হয়। তার আর বিশেষ কি গন্ধ থাকতে পারে। কে জানে, তবে এধরনের কুকুরের সংখ্যা খুব বেশী নয়।"

লক্ষ্মী জিজ্ঞেস করল, "আচ্ছা কুকুরটার বানডু নাম এল কোথা থেকে, ইংরিজি শব্দ বলে তো মনে হয় না।"

"সে আর এক গল্প। ঐ যে বললাম না যে সানফ্রানসিসকোতে ওদের বাড়ীর পাশে মিত্র পদবীর এক পরিবার থাকত। ওরা একদিন তাদের বাড়ীতে গিয়েছে। ওদের বাড়ীতে বাচ্চা ছেলেমেয়ে নেই। ওদের দুই মেয়ে। একজনের বিয়ে হয়ে গিয়েছে। আর একজন কলেজে পড়ে। কিছুক্ষণ খেলা করার পরে গর্ডন বাবা মা'র কাছে কান্না শুরু করে ছিল, 'আই হ্যাভ নো ফ্রেণ্ড (আমার কোনও বন্ধু নেই), তখন ঐ মিত্রমশাই গর্ডনকে বলেন "চল আমি তোমার সাথে খেলব, আমি তোমার ফ্রেণ্ড। আমাদের ভাষায় ফ্রেণ্ডকে বন্ধু বলে।" গর্ডন বন্ধু বলতে পারত না, বলত বানডু, সেই থেকে মিত্রমশাই গর্ডনকে বানডু বলে ডাকতেন। কুকুরটা বাড়ী এনে ফিল গর্ডনকে বলেছিল, হি ইজ্ ইওর ফ্রেণ্ড (এ তোমার বন্ধু)। গর্ডন বলল 'হ্যাঁ বানডু। সেই থেকে কুকুরটার নাম হয় গেল বানডু।"

অনিমেষ; "সত্যি এরকম কুকুরের কথা আগে কখনও শুনিনি। সত্যিই অদ্ভুত কুকুর। কুকুর সত্যি বড় উপকারী জন্তু।"

বিমান "সুশীলদা আমি কিন্তু আপনার দলে। কুকুর বাড়ীতে ঢোকাবেন না, কুকুর মোটেই সুবিধা জনক জীব নয়। ও বানডুই হোক আর বুদ্ধিমানই হোক, কুকুরের ওপর আমার রাগের দুটো বড় কারণ আছে। এক হচ্ছে, আমার ছোট পিসীর ছেলে নান্তুকে কুকুরে কামড়িয়েছিলো বলে। বেচারা তখন দশ বারো বছরের, চোদ্দটা 'সুঁই' নিতে হয়েছিল। আর দুই নম্বর হচ্ছে ঐ কুকুরের জন্য আমাদের ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ার বারোটা বাজতে বসেছিল। নেহাৎ সুনীল ছিল বলে বেঁচে গেছি।"

সুব্রত 'কেন আপনাকে কি হষ্টেলে কুকুরে তাড়া করেছিল।"

"না তার থেকেও ভয়ানক ব্যাপার। দৈবরোষের মুখে টেনে দিয়েছিলো।

মেনকা হাসতে হাসতে বলল, "সেই 'সারমেয় আসিয়া' গল্প?"

বিমলের গল্প বলায় নাম আছে। দেবীকা ব্যস্ত হয়ে বলল "বিমান ভাইয়া একটু থামো। অদিতিদের ডাকি। ওরা তোমার গল্প শুনতে খুব ভালোবাসে।" দেবীকা ডাকতেই ছেলে মেয়ের দল সিনেমা দেখা বন্ধ করে হুড়মুড় করে বসার ঘরে হাজির হল। অদিতি বলল "মামা, ভালো গল্পে দুনা মিষ্টি।"

"বিমল মনে থাকে যেন, ছানার জিলিপি হয়েছে দেখেছি। ওটা আমার খুব প্রিয়।"

ঘরের চারদিকে তাকিয়ে বিমান বলল, "সবাই এসে গেছে? তাহলে শুরু করি। আমাদের বাড়ী কৃষ্ণনগরে, বাবা উকীল ছিলেন। একান্নবর্তী পরিবার আমাদের, দাদুও উকিল ছিলেন। তবে আমার বাবা আর মেজ জ্যাঠা এরাই পড়াশুনা করেছিলেন ঠিক মতো। মেজ জ্যাঠা ডাক্তার ছিলেন, উনি বহরমপুরে প্র্যাকটিশ করতেন। ভালো পসার ছিল। ওঁরা বছরে দু' বছরে এক আধবার বাড়ী আসতেন। বড় জ্যাঠা ম্যাট্রিক পাস করে কোনও ক্রমে একটা মিষ্টির দোকানে ম্যানেজারী করতেন। একটু খিটখিটে লোক ছিলেন। ফলে পারিবারিক অশান্তি ছিল। আমার ছোটকাকা ছোটখাট একটা কি কাজ করতেন। মদ্যপ ছিলেন, কাকীমাকে প্রায়ই মারধোর করতেন, বাড়ীতে অশান্তি চলছিল এসব নিয়ে। মা একটু জোর করে বাবাকে বলে আমাকে বরাহনগর রামকৃষ্ণ মিশনে ভর্তি করে দিলেন। দিদিকে পাঠিয়ে দিলেন কলকাতায় আমার বাড়ীতে। দিদি তখন ক্লাস নাইনের ছাত্রী, আমি সেভেনের। আমরা হচ্ছি উচ্চ-মাধ্যমিকের তৃতীয় ব্যাচ, এখন তো মাধ্যমিক দশ ক্লাসে তারপর উচ্চ-মাধ্যমিক বারো ক্লাসে। আমাদের সময় এগারোতে উচ্চ-মাধ্যমিক, আমাদের আগে ছিল ম্যাট্রিক, দশ ক্লাস। তারপর দু' বছর আই. এ. বা আই. এস. সি। যাই হোক আমার ছোটবেলার থেকেই ইচ্ছে ছিল সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ার। নদীতে থাম বসিয়ে সেতু বানানো হয় কিভাবে সে বিষয়ে আমার ভীষণ কৌতূহল ছিল। উচ্চ-মাধ্যমিকে তখন অনেক বিভাগ ছিল, চালু কথা ছিল স্ট্রীম। ক্লাস নাইনে উঠে একটা কোনও ষ্ট্রীম বেছে নিতে হত। সায়েন্স স্ট্রীম, আর্টস স্ট্রীম, টেকনিকাল স্ট্রীম, কমার্স ইত্যাদি। ইঞ্জিনীয়ারিং পড়তে হলে সায়েন্স বা টেকনিকাল স্ট্রীমে পড়তে হত। প্রথম থেকেই ঠিক করেছি ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ব। হস্টেলকে আমরা আশ্রম বলতাম। স্কুলে বাইরের ছেলেরাও পড়ত। আশ্রমে ছেলেদের পড়াশুনা দেখাশুনার ভার ছিল কানাই মহারাজের ওপর। উনিই আমাকে বললেন টেক্নিকালে ভর্তি হতে। সেবারেই স্কুলে প্রথম টেকনিক্যাল স্ট্রীমে পড়ানো হবে, পদার্থবিদ্যা, রসায়ন বিদ্যা, আর অঙ্ক তো সায়েন্স স্ট্রীমে যারা আছেন তারাই পড়তে পারবেন। এছাড়া টেকনিকাল স্ট্রীমে আর একটা বিষয় ছিল জি. ই. ডি, জেনেরাল ইঞ্জিনিয়ারিং এ্যাণ্ড ড্রইং। এটা পড়াবার জন্যে এলেন সুকুমার দাশ। খুব ভালো মাষ্টার, ভালো ফুটবল প্লেয়ার। দেবদ্বিজে প্রগাঢ় ভক্তি। ক্লাস শুরু হওয়ার কিছুদিন পরেই স্কুলের সরস্বতী পুজো নিয়ে কথা হল।

সুকুমারবাবু বললেন "তোমরা ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ছ। তোমাদের দেবতা বিশ্বকর্মা, উনি দেবতাদেরও ইঞ্জিনিয়ার। দেবী সরস্বতীকেও পুজো করতে হবে। তবে বিশ্বকর্মা রুষ্ট হলে সমূহ বিপদ," উনি হেড্‌মাষ্টার মশাইকেও বোঝালেন।

বললেন 'সেখানেই লেদ মেশিন সেখানেই বিশ্বকর্মার পুজো করতে হয়। আমাদের লেদ্ মেশিন ততদিনে এসে গেছে। হেডমাষ্টার মশাই একটু ফ্যাঁসাদেই পড়লেন, রামকৃষ্ণ

মিশন, ছাত্রেরা পুজো করতে চাইছে, না ও বলতে পারেন না আবার হ্যাঁ বললে ফ্যাণ্ড থেকে পুজো বাবদ টাকা দিতে হবে, তাতে স্কুল কমিটির অনুমোদন নিতে হবে। যাই হোক সুকুমার বাবুর কৃতিত্বে স্কুল কমিটি সামান্য টাকা বরাদ্দ করলেন; যতদূর মনে পড়ে বরাদ্দ হল দুই কি তিনশো টাকা; সরস্বতী পুজোয় বরাদ্দ ছিল তিন হাজার টাকা। আমাদের ক্লাসে ছাত্রসংখ্যা দশ কি এগারো, আমরা বললাম, "আমরা চাঁদা দেবো।" স্কুলে সরস্বতী পুজোয় সব ছাত্রদের ভোগ প্রসাদ খাওয়ানো হত। সে এক এলাহী ব্যাপার। যেহেতু টাকা কম সেজন্য ঠিক হল পুজো দেখতে যারা আসবে তাদের শুধু ফল প্রসাদ দেওয়া হবে, শুধুমাত্র টেকনিক্যাল স্ট্রীমের ছাত্ররা আর যারা টেকনিক্যাল স্ট্রীমে পড়ান সেই মাষ্টার মশাইদের জন্য আশ্রমে আলাদা করে ভোগ প্রসাদের ব্যবস্থা হবে। পুজোর ব্যাপারে সবারই খুব উৎসাহ, তবে এক একজনের নজর এক একদিকে। আমি আর চন্দন আশ্রমের ছেলে, দু' জনেই লুচি এবং খিচুড়ির ভক্ত। ফলে পুজোর ভোগের ভার আমরা নিলাম। সুকুমারবাবুও নিশ্চিন্ত হলেন, কারণ আশ্রমের ছেলে বলে রান্না ঘরে ঠাকুরের ওপর তদারকি করতে পারব। সুমন নাকি জন্ম ইস্তক ইলেকট্রিসিয়ান, ইতিমধ্যে বার কয়েক শক্ টক্‌ও খেয়েছে। ওর পাড়াতুতো দাদা শম্ভুদার ইলেকট্রিকের দোকান আছে। ও বলল "আমি গেটে আলোর খেলা দেখাবো। মালার মতো আলো জ্বলবে, নিবভে।" ইন্দ্রজিৎ এবং তপনের লক্ষ্য সন্ধ্যেবেলার আরতির দিকে, কারণ তখন সুবেশী তরুণীরা ঠাকুর দেখতে আসবে। ওরা কি সাজপোষাক করবে এবং আরতির সময় মণ্ডপে কিভাবে থাকলে অন্যদের দৃষ্টি আকর্ষণ করা যায় সেটা নিয়ে জল্পনা কল্পনা শুরু করে ছিল। এই সূত্রে জানা গেল ইন্দ্রজিতের লক্ষ্য স্থির হয়ে গেছে। লক্ষ্য পাশের বাড়ীর স্বাতী। এখন শুধু তীর ছোঁড়ার অপেক্ষা। সুমন্ত, সুনীল, কমলেশ আর শচীনের কাজ হল রাত জেগে ঠাকুর পাহারা দেওয়া, রাত জাগার আসল কারণটা অবশ্য পরে জানা গেল। রাত জাগতে হলে মামলেট, চা ইত্যাদির নাকি অত্যন্ত প্রয়োজন। এদেশে ডিম যত সহজলভ্য আমাদের সময় ওঠা অত ছোটখাট ব্যাপার ছিল না। তাছাড়া স্কুলের ছেলে হয় চা খাওয়ার সুযোগ পাওয়া তখনকার দিনে এক বিরাট ব্যাপার। যাই হোক প্রত্যেকে নিজের নিজের দায়িত্ব তো ভালোভাবে পালন করলাম। গেটে আলোর মালা জ্বললো, পেটপুরে লুচি খিচুড়ি ইত্যাদি খাওয়া হল, ইন্দ্রজিতের সাথে স্বাতী পাক্কা দশ মিনিট কথা বলল এবং স্বাতীর বান্ধবী নমিতার সাথে তপনের আলাপ হল। সে আলাপ অবশ্য এখনও টিকে আছে। তবে ইন্দ্রজিতের ব্যাপারটা একটু ট্র্যাজিক হয়ে গেল। কারণ স্বাতীর বাবা পাড়া ছেড়ে উঠে যাওয়ায় ওদের সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে গেল। যাই হোক গল্পের ক্লাইমেক্স হচ্ছে রাত জাগা নিয়ে। ছোট হীটার জোগাড় করে সুমনের সহযোগিতায় বাল্বের পয়েন্ট থেকে হীটার জ্বালাবার ব্যবস্থা করা গেল। স্কুলের ঘরে তো আর এখানকার মতো প্লাগ পয়েন্ট থাকে না। আমাদের স্কুলের একটা বড় বারান্দা ছিল, তাতে একটা স্টেজ মতো ছিল। পুজো সেখানেই হত। তবে সরস্বতী পুজোয় প্যাণ্ডেল

করে ওটাকে একটা ঘরের মতো করে ফেলা হত, যাতে কুকুর-টুকুর ঢুকতে না পারে। আমাদের পয়সা কম। তাই আমরা ছাদের নীচে ঠাকুরের ঠিক ওপরে শামিয়ানা টাঙিয়ে দিলাম। আর ঠাকুরের চারদিকে এক ফুট উঁচু কাপড় দিয়ে একটা ব্যারিকেড করলাম। সুমন্তরা বলল "আমরা পালা করে রাত জাগবো, কুকুর বেড়া টপকে ঢুকতে পারবে না। তাছাড়া কুকুর আসার কোনো কারণ নেই। কুকুর ফল খায় না। আর আরতির পরে লুচি টুচি সব তো খেয়ে ফেলাই হবে। ওদের হাতে সব ভার দিয়ে আমরা শুতে গেলাম। তপন আর সুমন আমাদের সাথে আশ্রমেই শুতে এল। মিথ্যে বলব না, শুতে যাওয়ার আগে আমরাও এক টুকরো করে ডিমের মামলেট খেলাম, এক কেজি শশার দাম দেখিয়ে সেই পয়সায় রাত জাগার জন্য ডিম, চা আর গুড়ো দুধ কেনা হয়েছিল। আমরা চারজনে এক ঘরেই শুয়েছিলাম, তখন বোধহয় রাত দুটো বাজে। বিশ্বকর্মা পুজোর সময় ভোর রাতের দিকে বেশ ঠাণ্ডাই থাকে, সবাই গায়ে চাদর দিয়ে শুয়ে। কড়া নাড়ার আওয়াজে আমিই প্রথম জাগলাম। কে কে বলে চেঁচিয়ে উঠতেই সবাই ধড়পড় করে উঠে বসল।

বাইরে থেকে খুব অপরাধী গলায় সুনীল বলল, "চেঁচিয়ো না বন্ধু। আমাদের সমূহ বিপদ। সারমেয়র উৎপাত হয়েছে; পূজার ঘট প্রপাতধরণী তলে। তপন চেঁচিয়ে উঠল "কি? কুকুরে ঘট উল্টেছে? যাঃ হয়ে গেল ইঞ্জিনীয়ারিং পড়া। তখনই বলেছিলাম ভালো করে প্যাণ্ডেল কর। এখন বোঝ।"

আমাদের মধ্যে চন্দনের মাথা সবচেয়ে ঠাণ্ডা। আমরা সবাই তো ভয়ে কাঁটা তবে দেবতার রুদ্ররোষ থেকে কিভাবে বাঁচা যায় সে কথা না ভেবে, সুনীলের ওপর চোটপাট শুরু করেদিলাম। আমরা মোটামুটি ধরে নিয়েছি যে ইঞ্জিনীয়ার হওয়ার স্বপ্নের এখানেই সমাধি। এখন শুধু ধড়ে মাথা থাকলেই হয়। কমলেশ চোখ কচলাতে কচলাতে বলল সুনীল সাবধানে থাকিস। বিশ্বকর্মার হাতে হাতুড়ি আর বাটালি আছে, দেখেছিস তো। দেবে ঠকাস করে মেরে, মাথা দু'খণ্ড হয়ে যাবে।

"বোঝা গেল ঠাকুর দেবতার ওপর কমলেশের খুব একটা ভক্তি শ্রদ্ধা নেই। সুনীল ধরা গলায় বলল "বন্ধু এ সময়ে ঠাট্টা নয়। এই পাপকর্ম থেকে উদ্ধার পাওয়ার উপায় অবিলম্বে আবিষ্কার কর। না হলে সমূহ বিপদ।"

চন্দন সুনীলকে ধমক দিয়ে বলল "তুই এরকম শুদ্ধ ভাষায় কথা বলছিস কেন?"

কমলেশ "ওর অবস্থায় পড়লে তুই ভাঙা সংস্কৃতে কথা বলতিস। বড় মহারাজে০র কানে কথাটা পৌছাবার আগে কিছু ব্যবস্থা কর। বিশ্বকর্মা এখনও ঘুমাচ্ছে। সকালে উঠে যদি দেখে যে ঘট উল্টেছে তো...."

চন্দন "তুই ফাজলামি বন্ধ করবি। একটু চিন্তা করতে দে তো। আচ্ছা সুনীল তুই ঠিক দেখেছিস কুকুরে ঘট উল্টেছে? ওটা হয়তহাওয়াতে উল্টে গেছে।'

সুনীল 'না বন্ধু ঢক্ করে আওয়াজ হতেই আমার তন্দ্রা ভেঙে গেল, দেখি এক

কালো সারমেয় ঘটের মধ্যে মুখ ঢোকাবার চেষ্টা করছে। বুঝিলাম এ সারমেয়রই কীর্তি।'

কমলেশ 'আচ্ছা এ কুকুররূপী ধর্ম নয় তো? আমাদের পরীক্ষা করছে। আচ্ছা সুনীল তোর ঘুম কাটতেই তুই কি দেখলি কুকুরটা পালিয়ে যাচ্ছে নাকি শূন্যে মিলিয়ে গেল?"

চন্দন 'কমলেশ তুই থামবি।' আমাদের দিকে তাকিয়ে বলল "আমার মনে হয় কানাই মহারাজকে গিয়ে সব বলি, উনি যা বিধান দেবেন তাই মানা উচিৎ।"

কমলেশ 'আরে এতো ঝামেলার কি দরকার? ঘটটা সোজা করে বসিয়ে জল ভরে দে, তারপর ডাবটাব দিয়ে সাজিয়ে যেমন ছিল তেমন রেখে দে। ঠাকুরও বুঝতে পারবে না। তবে তোরা যা ঠিক করার কর। আমি আর সুমন্ত চললাম। কুকুরটা হয়ত এতক্ষণে ঠাকুরের গা চাটছে। আমরা ঠাকুর পাহারা দিতে চললাম। 'সুমন্ত কড়া দু' কাপ চা করা যাক্। চোখ যেন একদম না বোজে।

কমলেশ আর সুমন্ত চলে যেতে আমরা সবাই ঠিক করলাম কানাই মহারাজকে গিয়ে সব খুলেই বলি। সুনীলই বলবে বলল।

কানাইদার ঘর দোতালায়। কথা বার্তায় প্রায় ঘন্টা খানেক কেটে গেছে, সুনীল তো ভয়ে ভয়ে মহারাজের কড়া নাড়ল। আমরা সবাই অপরাধীর মতো মাথা নীচু করে পেছনে দাঁড়িয়ে, ভয়ে বুক কাঁপছে। বার কয়েক কড়া নাড়ার পর মহারাজ ভেতর থেকে বললেন 'কে?'

সুনীল— "মহারাজ আমরা"

"কে তোমরা?"

সুনীল— "পাপীর দল।"

ততক্ষণে মহারাজ বাইরে এসে আমাদের দেখতে পেলেন। ঘরের লাইট জ্বলছে। বারান্দার লাইটও জ্বালিয়ে দিলেন। আমাকে আর চন্দনকে দেখে বললেন কি হয়েছে? তোমাদের মুখ একদম শুকিয়ে গেছে দেখছি? এস ভেতরে এস।"

ভেতরে ঢুকেই সুনীল মহারাজের পায়ের কাছে হাঁটু গেড়ে বসে কান্না কান্না গলায় বলল— "মহারাজ আমি নরাধম। আমার অবিমৃষ্যকারিতার জন্য সারমেয় আসিয়া ঘট উল্টাইয়া দিয়াছে। এখন আপনি বিধান দিন। সমস্ত শাস্তি নত মস্তকে মেনে নেবো।"

কানাইদা সুনীলকে হাত ধরে তুলে বিছানায় বসিয়ে বললেন 'দূর পাগল, পাপ বলে কিছু নেই, একটা অন্যায় হয়ে গেছে এই আর কি। তার আর কি করা। পাহারা দিতে গিয়ে ঘুমিয়ে পড়েছিলি বুঝি?'

'না মহারাজ চোখ একটু জড়িয়ে পড়েছিল, এমন সময় ঐ দুর্বৃত্ত সারমেয়।'

'আচ্ছা ঠিক আছে। জানিস দেবতাদের অসীম ক্ষান্তি। ক্ষান্তি কি জানিস?'

মহালয়ার সময় বীরেন ভদ্রের চণ্ডী পাঠে শুনেছিলাম "যা দেবী সর্ব ভূতেষু ক্ষান্তি

রূপেন সংস্থিতা—নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নম নমঃ। তবে ক্ষান্তি মানে কি জানতাম না। সবাই ঘাড় নেড়ে না বলাতে কানাইদা বললেন "অপরাধীকে সম্পূর্ণভাবে পরাস্ত করার শক্তি থাকতেও যদি তাকে ক্ষমা করা হয় তাই ক্ষান্তি। ধর একটা বাচ্চা ছেলে তোকে লাথি মারল। তুই ইচ্ছে করলে তাকে তুলে আছাড় দিতে পারিস, কিন্তু তা না করে তুই ছেলেটাকে ক্ষমা করলি। এটাই হল ক্ষান্তি। দেব বা দেবীদের অসীম ক্ষান্তি। তুই ভুল করেছিস, মনে মনে ক্ষমা চা, তাহলেই হবে। তবে পুজোর ঘট তো আবার পূর্ণ করতে হবে। ঘট আবার প্রতিষ্ঠা করাটাই ঠিক হবে। তবে এত রাতে দেবেন পুরোহিতকে ডাকার দরকার নেই। তোরা এক কাজ কর। গঙ্গায় গিয়ে ঘট ধুয়ে পূর্ণ ঘট নিয়ে এসে বসিয়ে দে। গঙ্গার স্পর্শে সব অন্যায় ধুয়ে যাবে। কথাটা পাঁচ কান করিস না, আমি দেবেনকে সব বুঝিয়ে বলব। তোরা এখনই ঘট নিয়ে যাত্রা কর। ঠাকুরের কৃপায় সব ঠিক হয়ে যাবে।"

মহারাজের কথায় আমরা আশ্বস্ত হলাম। ঠিক হল সুনীল, আমি, চন্দন, আর তপন গঙ্গায় যাবো। সুনীল বলল ও পূর্ণ ঘট মাথায় করে নিয়ে এসে আবার প্রতিষ্ঠা করবে। গঙ্গার ঘাট আশ্রম থেকে প্রায় মাইল দেড়েক দূরে। আধঘণ্টা হেঁটে সেখানে পৌঁছালাম, ঘাটে এসে সুনীল ঘটটা গঙ্গার পাড়ে রেখে হঠাৎ পট পট করে জামা গেঞ্জি খুলে ফেলে মা মা বলে চিৎকার করে গঙ্গায় ঝাঁপ দিল। আমরা তো ঘাবড়ে গেলাম। ওকি আত্মহত্যা করবে। আমরা চেঁচিয়ে উঠলাম। 'সুনীল কি করছিস উঠে আয়। 'অত ঠাণ্ডায় চট্ করে জলে নামতে কেউ সাহস করলাম না। সুনীল এক গলা জলে দাঁড়িয়ে 'জবাকুসুম সংকাস্যং ...' বলে সূর্য প্রণাম করে পাড়ে এসে ঘটটা নিয়ে ঘট পূর্ণ করল। তারপর ভিজে প্যাণ্ট আর খালি গায়ে উঠে এসে বলল 'চ'।

বললাম এত ঠাণ্ডায় ভিজে প্যান্ট, খালি গায়ে এতটা পথ হাঁটলে ঠাণ্ডা লাগবে। জামাটা পরে নে।'

'পাপের প্রায়শ্চিত্ত এভাবেই করতে হয়' বলে হনহন করে হাঁটা শুরু করল। অগত্যা আমরাও পিছু পিছু চললাম। ঘট প্রতিষ্ঠা হল, সকালে দেবেন পুরোহিত এসে পুজো আচ্চা করলেন। দধিকর্মা খাওয়ার সময়ই সুনীল বলল 'আমার গলা ব্যথা করছে।' বিকেলে ঠাকুর বিসর্জনের সময় সুনীলকে দেখা গেল না। পরের দিন ক্লাসে কমলেশ বলল 'সুনীলের জ্বর। বিসর্জনের পরে ওদের বাড়ী গিয়েছিলাম। ওর মা বললেন যে সুনীলের জ্বর, প্রলাপ বকছে। 'ঐ কুকুর এল, তাড়াও তাড়াও।' সুনীলের জ্বর শুনে আমাদের মনটা খারাপ হয়ে গেল, দিন তিনেক পরে সুনীল সুস্থ হয়ে ক্লাসে এল।

বিমান গল্প বলা শেষ করতেই সুশীলবাবু বললেন "তোমার কুকুর বিদ্বেষের কারণ বোঝা গেল"

দেবী "আচ্ছা সুনীলের কি শেষ মেষ ইঞ্জিনীয়ারিং পড়া হয়েছিল?"

হ্যাঁ, ভিজে গায়ে অতটা হাঁটা কি বৃথা যায়। ওর ত্যাগের ফলে সবারই লাভ

হয়েছে বলতে পারেন। "আমাদের ক্লাসের সবাই ইঞ্জিনীয়ারিং বা লাইসেনসিয়েট করেছে। সুনীল তো আই. আই. টিতে মেকানিক্যাল নিয়ে পড়ে জেসপ্ এ চাকরি করত। এবার গিয়ে শুনলাম ও টেলকোতে ম্যানেজার।"

অদিতি বলল "মামা গল্পটা ভালোই, তবে কুকুর বিদ্বেষী। তেমার দুনা মিষ্টি তো গেলই। এক প্লেটও পাবে না।

অদিতিদের বাড়ীতে ঠাকুরের সিংহাসনে জলভরা ঘট থাকে। চারদিকে বেড়াও নেই।

সত্যাগ্রহ

"উইলমা, লক্ষ্মী সোনা আমার। কাপড়গুলো একটু বাইরে মেলে দে মা। সন্ধ্যের মধ্যে ইস্তিরী করে বাবুদের দিতে হবে। কাল আবার সোমবার। ধোপদুরস্ত জামা চাই। দেরী হলে পয়সা তো কাটবেই, গালিগালাজও করবে।"

"যাই মা, আজ রোদ ভালোই আছে। দু'-তিন ঘন্টাতেই শুকিয়ে যাবে।"

কৃষ্ণাঙ্গ উইলমা জনসনের মা মেরী, সাহেবদের বাড়ীর কাপড় কাচে, ঘরদোর সাফ্ করে। বাবা মারা গেছেন বছর-তিন আগে, কাজ করতেন একটা মুদীর দোকানে। ট্রাক থেকে মাল নামানো, গুদাম থেকে চাল, আটা ইত্যাদি বের করে দোকানের ভেতর সাজিয়ে রাখা এসব করতেন উইলমার বাবা গ্যারী। শ্বেতাঙ্গ দোকানী টম সাহেব ভালো লোক, গ্যারী মারা যাওয়ার পর উইলমার বড় দাদা ববকে চাকরিটা দিয়েছেন। ছোট দাদা ড্যানী অনেক খুঁজেও কোনও স্থায়ী চাকরি পায়নি। গ্যারী বেঁচে থাকতেও মেরী বাড়ী বাড়ী কাজ করতেন।

ড্যানী একদিন অনুযোগ করায় মেরী বলেছিলেন "এখনই খাটার বয়স। এখন পয়সা জমিয়ে না রাখলে শেষ বয়সে খাব কি? তোর বাবার চাকরি যতদিন ততদিনই মাইনে পাবে। তারপর? সরকার থেকে কোনও ভাতাও আমরা পাবো না।

বব বলেছিল "কেন? আমরা তোমাকে দেখবো।" একটু হেসে মেরী বলেছিল "তোদের সব নিজের নিজের সংসার সামলাতে হবে না তখন!"

মেরী বুধ আর শনিবার বাবুদের কাপড় এনে কেচে ইস্তিরী করে পরের দিন দিয়ে আসতেন। উইলমা মাকে যতটা পারত সাহায্য করত। উইলমার খুব সখ ছিল পড়াশুনা করার। দেশবিদেশের ইতিহাস জানার। উনিশশো পঞ্চাশ-এর দশকে আমেরিকার কৃষ্ণাঙ্গ মেয়ে উইলমার স্বপ্ন সার্থক করার কোনও উপায় ছিল না। কৃষ্ণাঙ্গদের জন্য নির্দিষ্ট আলাদা স্কুলে কিছুটা লেখাপড়া করেছিল উইলমা। ইংরাজী বই পড়তে পারত একটু আধটু। তাতেই উইলমাকে সন্তুষ্ট থাকেতে হয়েছে। অবশ্য সন্তুষ্ট না হয়ে উপায়ও ছিল না ;কারণ পঞ্চাশের দশকে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের এ্যালাবামা রাজ্যের মন্টগোমারী শহরসহ অন্যান্য শহরে কৃষ্ণাঙ্গরা ছিলেন কার্যত অচ্ছুৎ।

অনেক চেষ্টার পরে এক দর্জির দোকানে চাকরি পায় উইলমা। কাজের জায়গা বাসা থেকে প্রায় মাইল চারেক দূরে। অবশ্য বাড়ী থেকে মিনিট পাঁচেক হাঁটলেই বাস। সেটা একদম ঐ দর্জির দোকানের কাছেই নামিয়ে দেয়। কাজ পাওয়াতে খুশীই হয়েছিল উইলমা, কিন্তু ছোটদা ড্যানীর জন্য মনটা খুঁত খুঁত করছিল। বেচারী চেষ্টার ত্রুটি করে না, মাঝে মাঝে দু' তিন দিনের কাজ হয়ত পায় তবে হাতে টাকা থাকে না ড্যানীর। মদ খেয়েই টাকা শেষ হয়ে যায় দু' তিনদিনের মধ্যে। এই করে দিনকে দিন ড্যানী কি রকম বদমেজাজী হয়ে যাচ্ছে। উইলমা কিছু বোঝাতে চেষ্টা করলে ভীষণ রেগে যায়। ড্যানীর যত রাগ সাদা সাহেবদের ওপর ;"ওদের জন্যই আমরা শুয়োরের জীবন কাটাচ্ছি। একই মালঠেলে সাদা টোনী পাবে ঘন্টায় দু' ডলার। আর কালো ড্যানী পাবে এক ডলার। তার ওপর ফাউ হিসেবে নিগার বলে গালি গালাজ।"

উইলমা বোঝে না কেন এমন হয়। তবে এটুকু জানে যে ওরা ক্রীতদাসদের বংশধর। তাই জাতে ছোট। চার্চে পাদরী যখন বলেন, 'যিশুর সব পুত্রই তার কাছে সমান আদরের' তখন এক এক সময় উইলমা ভাবে পাদরীকে জিজ্ঞেস করে— 'তাহলে কালাদের কেন বাসের পেছনে বসতে হয়? আর সাদারা এসে দাঁড়ালে কেন আসন ছেড়ে দিতে হয়?' তবে সাহস করে কোনও দিনই এসব কথা বলেনি উইলমা, 'এটাই এ শহরের নিয়ম, কি আর করবো' বলে নিজকে সান্ত্বনা দিত সে। কোনও শ্বেতাঙ্গ এসে সামনে দাঁড়ালে আসন ছেড়ে না দিলে বাসচালক বাস থামিয়ে পুলিশ ডেকে কৃষ্ণাঙ্গটিকে গ্রেপ্তার করিয়ে দিত, এ ধরনের নিয়ম শুধু মন্টগোমারী নয়, আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের দক্ষিণ অংশের অনেক শহরেই চালু ছিল সেকালে।

কোনও কিছু শুরু হলে তার শেষ হবেই। মেঘ কখনই অনন্তকাল ধরে সূর্যকে ঢেকে রাখতে পারে না। মানুষের একটা সহজাত প্রবৃত্তি হচ্ছে স্বাধীনতা, কারণ তার অন্তস্থ আত্মা নিত্যমুক্ত—তাই সে সব সময়ই মুক্তির দিকে ধাবমান হয়। আর এই মুক্তির আকাঙ্ক্ষাই তাকে একতার দিকে নিয়ে যায়। তবে কিছু অহং সর্বস্ব মানুষ, যারা অজ্ঞানের তিমিরে বাস করে, তারা বিদ্বেষের প্রাচীর তুলে পৃথিবীকে ভাগ করে স্বার্থসিদ্ধির লোভে। তারা মূর্খের স্বর্গে বাস করে আর ভাবে অনন্তকাল ধরে এই অসত্যের বেসাতি চালু রাখা যাবে। যার নিজের মান সম্বন্ধে হুঁশ আছে সেই মানুষ, যখন এই হুঁশ আসে তখনই সে মাথা তুলে দাঁড়ায়। মুক্ত হওয়ার চেষ্টা করে। ঘটলও ঠিক তাই, ১৯৪১র পয়লা ডিসেম্বর। প্রতিবাদটি সামান্য হলেও আমেরিকা তথা সারা বিশ্বকে এক নতুন চেতনার রাজ্যে উন্নীত করতে সাহায্য করল মন্টগোমারীর কৃষাঙ্গ শ্রীমতী রোজা পার্কস। বর্ণবৈষম্য সহ বিভিন্ন ধরনের বৈষম্য সম্বন্ধে তথাকথিত সভ্য বিশ্বের ঘুম ভাঙালো কালো মেয়ে রোজা।

উইলমা যে পাড়ায় কাজ করে সে পাড়ারই একটা দোকানে কাজ করতেন শ্রীমতী পার্কস। সারা বছর কাজ করে একটু একটু করে পয়সা জমায় অনেকেই, ডিসেম্বরের

বড়দিনের উৎসবের সময় পরিবার পরিজনদের নিয়ে একটু আনন্দ করবে বলে, উৎসবের দিনে সবাইকে নতুনজামা, বাচ্চাদের খেলনা ইত্যাদি উপহার দিয়ে আনন্দের ভাগীদার হতে চায় সকলেই। কাজের শেষে সেরকম কিছু বাজার সেরে বাড়ী ফিরছিলেন শ্রীমতী পার্কস, সারাদিনের খাটুনী আর বাজার ঘুরে কেনা কাটার ফলে উনি খুবই ক্লান্ত বোধ করছিলেন। তার ওপর আবার হাতে উপহারের বাক্সগুলোও ছিল। তাই বাসে উঠে পঞ্চম সারিতে বসার জায়গা পেয়ে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললেন উনি। এতক্ষণে পাদুটো একটু বিশ্রাম পাব। তার সেই নিশ্চিন্ততা ভেঙে গেল কিছুক্ষণ পরেই, যখন একদল শ্বেতাঙ্গ উঠল বাসে। বাস তখন ভর্তি, একটাও বসার জায়গা নেই। 'আইনতঃ' শ্রীমতী পার্কস এর আসন ছেড়ে উঠে দাঁড়ানোর কথা। কিন্তু শ্রীমতী পার্কস আসন ছেড়ে উঠলেন না।

বাস চালক চেঁচিয়ে বললেন "আসন ছেড়ে পেছনে চলে যাও, নয়ত পুলিশ ডাকবো" কথাটা কানেই নিলেন না শ্রীমতী পার্কস। যথারীতি পুলিশ এসে শ্রীমতী পার্কসকে গ্রেপ্তার করল। গ্রেপ্তার যে হবেন তা ভালোভাবেই জানতেন শ্রীমতী পার্কস। কারণ সে বছরই জায়গা না ছাড়ার জন্য জনা সাতেককে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ, একজন কৃষ্ণাঙ্গ এই 'অপরাধের' জন্য বাসযাত্রীদের গুলিতে প্রাণও হারিয়েছিল, শ্রীমতী পার্কস বিচলিত হলেন না, স্বেচ্ছায় কারাবরণ করলেন তিনি। শুরু হল আমেরিকার তথা বিশ্বের ইতিহাসের এক নতুন অধ্যায়।

বাড়ী ফেরার পথে এই গ্রেপ্তারের ঘটনা শুনল উইলমা। পরের দিন এই গ্রেপ্তারের প্রতিবাদে ডেক্স্টার এভিনিউ-এর বাপটিস্ট চার্চে একটা সমাবেশের আয়োজন করা হয়। তাতে পাড়ার আরও কয়েকজনের সাথে উইলমা আর ড্যানীও যোগ দিল। ঐ সমাবেশে ডঃ মার্টিন লুথার কিং (জুনিয়ার) এর বক্তৃতা সবাইকে উদ্বুদ্ধ করল। ঠিক হল পরের সোমবার অর্থাৎ ডিসেম্বরের পাঁচ তারিখে বাসে বৈষম্য মূলক আইনের প্রতিবাদে বাস বর্জন করবে কৃষ্ণাঙ্গরা। চারিদিকে খবর ছড়িয়ে পড়ল। বিলি হল অসংখ্য ইস্তাহার। সমাবেশ থেকে ফেরার পথে উইলমা বুঝতে পারল এই প্রতিবাদে অধিকাংশ কৃষ্ণাঙ্গ সামিল হবে। অনেক সহ্য করেছে তারা, আর নয়, রাস্তার জলের কলে জল খেতে পাবে না কৃষ্ণাঙ্গরা, দোকানে পয়সা দেওয়ার লাইনে অগ্রাধিকার পাবে শ্বেতাঙ্গরা, এমনকি বাসের জন্য অপেক্ষাও করতে হয় আলাদা ভাবে। উইলমারের মতো অনেকেই অপমানিত বোধ করত এসবে, কিন্তু উপায় ছিল না কিছুই। এই প্রতিবাদে তাই অনেকেই সামিল হতে এগিয়ে এল। ছোড়দা ড্যানীতো সারা রাস্তা সাদাদের গালিগালাজ করতে করতে বাড়ী ফিরল। কিন্তু উইলমারের একটু চিন্তাও হল। চাকরীটা নতুন। কাজে না গেলেই নয়। কিন্তু এতটা রাস্তা যাবে কি করে। রবিবারে খবর পেল অনেক কৃষ্ণাঙ্গ ট্যাক্সিচালক অল্পদামে যাত্রীদের কাজের জায়গায় পৌঁছে দিতে রাজী হয়েছে। ওর পাড়ার অনেকেই ঠিক করেছে হেঁটেই যাবে। উইলমা ও তার এক বান্ধবী বার্ব ঠিক করল সকালে ট্যাক্সিতে যাবে, ফিরবে হেঁটে।

কৃষ্ণাঙ্গদের এধরনের যৌথ প্রতিবাদ এই প্রথম। সবার তাই একটু ভয়ও হল, যদি সাদা রাগী ছোকরার দল মারধোর শুরু করে—এ ভাবনা অনেককেই ভাবিয়ে তুলল।

মেরী উইলমাকে বলল, "কাল সাবধানে থাকবি"। এতটা রাস্তা একা যাস না। সঙ্গী সাথী জোগাড় করে নিস্। ফেরার সময় কাজ শেষ হলেই বেরিয়ে পড়বি। দরকার হলে ট্যাক্সি নিস্। শুনেছি কাল সস্তায় ট্যাক্সি পাওয়া যাবে।" পরের দিন সকালে বব্ বাদে উইলমাদের বাড়ীর সবাই একটু তাড়াতাড়িই উঠল। কাজে যেতে সময় বেশী লাগবে, চারিদিকে একটা থমথমে ভাব। পাড়ার অনেকেই উদ্‌বিগ্ন। জলখাবারের জন্য উইলমা আর ড্যানী খাওয়ার টেবিলে এল। উইলমা সবার জন্য প্যান কেক (অনেকটা পাটিসাপটার মতো খেতে, তবে নোনতা। মোটা রুটির মতো দেখতে। অল্প তেলে পরোটার মতো ভাজা হয়) ভাজতে ভাজতে বলল "ছোড়দা একটু বেশী করে খা। তোকে তো অনেকটা হাঁটতে হবে।"

· কফি ঢালতে ঢালতে ড্যানী বলল, "না হাঁটবো না। আমরাই আজ সবচেয়ে মজা করে যাবো। বেশ হাত পা ছড়িয়ে বসা যাবে।"

মেরী "সেকি। তুই বাস বর্জন করবি না?"

"একশোবার।"

উইলমা "তবে? টোনীর ট্যাক্সিতে যাবি? ও কি তোর কাছ থেকে পয়সা নেবে না বলেছে?"

"না, না, আমরা যাবো ছ্যাকরা ঘোড়ার গাড়ীতে।"

মেরী "আমরা মানে?"

"আমি, ফিল্, সাদা জ্যাক্ আর টম। ওপাড়ার ববের একটা ঘোড়ার গাড়ী আছে। মাল বওয়ার জন্য ভাড়া খাটে। ও বলেছে সকালে কাজে যাওয়ার সময় আমাদের নিয়ে যাবে, আর সন্ধ্যেবেলায় ফেরার সময় নিয়ে আসবে, কাল কোনও পয়সা নেবে না, তবে সন্ধ্যেবেলায় ফিরতে একটু দেরী হবে।"

একটু রেগে মেরী বলল "তোমার দেরী করে বাড়ী ঢোকা নতুন কিছু নয়। তবে আজ আবার মদ গিলতে বোসো না। সন্ধ্যে সন্ধ্যে বাড়ীতে এসো। রাস্তায় আবার কি গণ্ডগোল হয় কে জানে। রাগী ছোকরার দল তো রাতেই বেরোয় হামলা করতে।"

উইলমা প্যানকেকগুলো টেবিলে রাখতে রাখতে ড্যানীকে বলল "জানিস তো, আজ রোজা পার্কসের বিচার আছে। তারপর সন্ধ্যেবেলায় হোল্ট চার্চে একটা সমাবেশ হবে। শুনেছি সেই নতুন পাদরী, কি যেন নাম সেও আসবে। তুই যাবি নাকি? আমি তো ভাবছি যাবো।

মেরী তাড়াতাড়ি বলল, "না থাক্, তোমার আর গিয়ে কাজ নেই সোনা। একে তো হেঁটে আসতে হবে। বেশী রাত করে একা মেয়ে রাস্তায় থাকা ঠিক হবে না। বিশেষ করে এরকম গণ্ডগোলের দিনে।"

ইতিমধ্যে বড় ছেলে বব খাওয়ার টেবিলে বসে বলল, "তোমরা এত কথা বলছ যে শুয়ে থাকা গেল না। আমার তো পাঁচ মিনিটের পথ। আরও পরে উঠতে পারতাম। উইলমা, আমার জন্য প্যানকেক করেছিস, না আমাকেই ভাজতে হবে?"

"হ্যাঁ করেছি। কম পড়লে মাকে বলিস। ভেজে দেবে। মায়ের তো আর তাড়া নেই। আচ্ছা দাদা তোর মধ্যে একটা উত্তেজনা হচ্ছে না?"

"আমার বিরক্ত লাগছে। শুধু শুধু একটা গণ্ডগোল লাগানো। দেখ গে যা সবাই বাসেই যাবে। আর একদিন বাসে না চাপলে কার কি এসে যায়? নিয়ম পাল্টানো কি অতই সোজা? মাঝখান থেকে কিছু লোকের হয়রানি। কত বুড়োবুড়িকে কাজে যেতে হয়। বেচারীরা কি করবে? একদিনের রোজগার গেল। ওদের হয়ত উপোস করেই কাটাতে হবে।"

একটু রেগে ড্যানী বলল, "তোর শুধু সাদাদের পা-চাটা স্বভাব। মাঝে মাঝে একটু তেড়ে ফুঁড়ে না উঠলে ও ব্যাটারা গলায় পা দিয়ে পিষবে।"

বব একটু দমে গিয়ে বলল "তাই বলে সব সাদারাই বাজে লোক নয়।"

মেরী ওদের ঝগড়া থামাতে মধ্যস্থতা করার চেষ্টা করল, "সে ঠিক, দেখ না টম সাহেব আর তার বৌ কত ভালো লোক।"

ড্যানী—"দু'চারটে লোক দিয়ে সবাইকে বিচার করা যায় না। তবে সাদাদের মধ্যেও অনেকে কাল বাস বর্জন করবে। যেমন আমার বন্ধু জ্যাক্। উইলমা, তুই যাবি কি করে?"

"কেন টোনীর ট্যাক্সিতে। ওর বোন বার্বও তো কাজে যাবে। বলেছে একটু তাড়াতাড়ি বেরোতে। রাস্তায় যাত্রী ওঠাবে, নামাবে। মাথাপিছু পঞ্চাশ পয়সা করে নেবে। বিকেলে হেঁটে ফিরবো ভাবছি। তা নাহলে আমার মনে হবে প্রতিবাদ করা হল না। ড্যানী আর উইলমা বেরোতে যাবে এমন সময় বার্ব এসে হাঁফাতে হাঁফাতে বলল "প্রতিবাদ সফল হতে চলেছে। এখন অবধি দুটো বাস যেতে দেখলাম। প্রথমটা একদম ফাঁকা। দ্বিতীয়টায় মাত্র একজন সাদা যাত্রী।"

ড্যানী চেঁচিয়ে বলল "হুররে। আমরা তাহলে একজোট হ'তে পেরিছি।"

বব মুখ বেজার করে বলল—"ও প্রতিবাদ আর কতক্ষণ টিকবে? পুলিশের গুঁতো খেলেই সব বাছাধন আবার সুড়সুড় করে বাসে চাপবে। যত সব হুজুগ।" কথা না বাড়িয়ে ড্যানী, উইলমা আর বার্ব বেরিয়ে গেল। সবার মধ্যেই একটা আনন্দ মেশানো উত্তেজনা; উইলমা সেদিন কাজের জায়গায় তাড়াতাড়ি পৌছালো। পথে টোনী আরও জনা তিনেক যাত্রীকে তুলেছিল। সবাই উঠেই পঞ্চাশ সেন্ট ভাড়া দিয়ে দিল, উইলমা রাস্তায় অনেককে হেঁটে যেতে দেখল, ড্যানীদের মতো অনেকে ঘোড়ার গাড়ীতেও যাচ্ছে। এসব দেখে ট্যাক্সিতে সবাই খুব খুশী। একজন বলল "রোজাকে হয়ত জরিমানা করবে না। বাস বর্জন এতটা সফল হবে তা কেউ ভাবেনি।" আর একজন বলল "না মশাই, সাদা জজ অত

সহজে জরিমানা থেকে রেহাই দেবে না। আমার পাশের বাড়ীর ছেলেটাকে একই অপরাধের জন্য পনেরো ডলার জরিমানা করেছিল। রোজাকেও একই জরিমানা করবে।"

বিকেলে কাজ থেকে বেরিয়ে উইলমা দেখল অনেকেই হাঁটছে। মিনিট দুয়েক হেঁটে গেলেই বার্ব-এর কাজের জায়গাটা। ওখানে গিয়ে একটু অপেক্ষা করতেই বার্ব বেরিয়ে এল। একটু জোরে হাঁটা শুরু করল ওরা দু'জনে। ঘন্টা খানেক লাগবে বাড়ী পৌঁছাতে। যেতে যেতে ওরা শুনল রোজা পার্কসকে পনেরো ডলার জরিমানা করা হয়েছে, কেউ কেউ বলল নেতারা এই বৈষম্যমূলক আইন পাল্টানোর জন্য লাগাতার বাস বর্জন করার কথা ভাবছেন। অনেকেই কাজ সেরে হোল্ট বাপটিষ্ট চার্চের জমায়েতে যাচ্চে। উইলমা, কিন্তু মায়ের কথা ভেবে ওখানে না যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিল। বার্ব ও উইলমারের সাথে একসাথে বাড়ীর দিকে হাঁটা দিল।

সারা রাস্তায় জনস্রোত অগণিত কালো মানুষ যারা স্বাধীনতা পাওয়ার দুশো বছর পরেও পরাধীন, তারা একজোট হয়ে এগিয়ে চলেছে। লক্ষ্য সমঅধিকার, সাম্য যার শেষ-কথা। মুক্তি প্রার্থীর শরীর মনের অধীন। অন্তরাত্মা যখন জেগে ওঠে তখন বহিরঙ্গের বাধা তাকে ধরে রাখতে পারে না। শত বাধাবিপত্তি শারীরিক কষ্ট তুচ্ছ বলে বোধ হয়। মন্টাগোমারীর বাসবর্জনের খবর সংগ্রহ করতে দূরদর্শন ও বেতার সংস্থার সাংবাদিকেরা রাস্তায় ঘুরছেন। দূরদর্শনের এক সাংবাদিক উইলমাদের কাছে এসে পাশের এক বৃদ্ধাকে জিজ্ঞাসা করে জানলেন যে উনি কাজের পরে বাড়ী ফিরছেন। বাড়ী অনেকটাই দূরে। সাংবাদিকটি বৃদ্ধাকে জিজ্ঞেস করলেন, "আপনি ক্লান্ত বোধ করছেন না?" উত্তরে বৃদ্ধা বললেন, "হ্যাঁ আমার পা দুটো ক্লান্ত, কিন্তু আমার মন নয়।" কথাগুলো শুনে উইলমা বৃদ্ধার হাত জড়িয়ে বলল, "আপনি আমাদের সবার মনের কথা বলছেন।"

বাড়ী ফিরতে প্রায় সন্ধ্যে হয়ে গেল। দরজায় টোকা দিতেই মেরী ছুটেএসে দরজা খুলে দিয়ে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বললেন, "যাক্ অন্ততঃ তুই ফিরলি। বব মাঝে এসেছিল, আজ দোকান একটু দেরী করে বন্ধ করবে। অনেকেই দেরী করে বাড়ী ফিরবে বলে মনে হচ্ছে তাই। ড্যানী কখন আসে দ্যাখ, ওর জন্যই আমার চিন্তা বেশী, মাথাগরম করে মারপিঠ না বাঁধায়।"

"মা, তুমি শুধু শুধু ভাবছ। ড্যানীর ফিরতে একটু দেরী হবেই। ও সম্ভবতঃ হোল্ট চার্চের জমায়েতে যাবে।

মেরী একটু চিন্তিত হয়ে বলল, "তুই খেয়ে নে। বব আর ড্যানী এলে আমি খাবো।"

"আমার একটু ক্ষিদে পেয়েছে। তবে এখন একটু কফি আর টোস্ট খাই। ওরা সবাই এলে এক সাথেই খাবো। তুমিও একটু কফি আর টোষ্ট খাও।"

"না"

"না কেন? আমি কফি করছি।"

রাত নটা নাগাদ বব এল। ড্যানীর তখনও দেখা নেই।

উইলমা, "মা এস আমরা তিনজনে খেয়ে নিই, ড্যানীর ফিরতে রাত এগারোটা বাজবে হয়ত। ও নিশ্চয় বাইরে কিছু খেয়ে নেবে।"

বব আর উইলমা জোর করতে মেরী খেতে বসল। ওরা ভুট্টা সেদ্ধ আর হ্যামবারগার (দু'টুকরো পাঁউরুটির মধ্যে রান্নাকরা গরুর মাংসের কিমার টিকিয়া দিয়ে তৈরী) দিয়ে নৈশভোজ সারল। ড্যানী ফিরল রাত প্রায় সাড়ে দশটা নাগাদ। বব ততক্ষণে শুয়ে পড়েছে। ওদের বাসায় একটাই শোওয়ার ঘর আর একটা বড় ঘর যাতে খাওয়ার টেবিল আর একটা লম্বা পুরোনো সোফা রাখা আছে। বড় ঘরটার একপাশে ছোট একটা রান্নাঘর মতো আর তার পাশে একটা বাথরুম। সাধারণতঃ শোওয়ার ঘরে উইলমা আর মেরী শোয়, আর দুই ভাই মেঝেতে বিছানা পেতে শোয়। আজ ড্যানীর দেরী দেখে ওরা ঠিক করল বব আর ড্যানী শোওয়ার ঘরে শোবে। মেরী আর উইলমা ড্যানীর জন্য জেগে বসে থাকল।

ড্যানী ফিরেই বলল, "তোমরা খেয়ে নিয়েছ নিশ্চয়। আমি কিন্তু বাইরে খেয়ে নিয়েছি।"

উত্তেজনা মেশানো গলায় উইলমা জিজ্ঞেস করল, "ছোড়দা তুই নিশ্চয় সমাবেশে গিয়েছিলি। কি হল রে ওখানে? কাল কি বাস বর্জন চলবে?"

"হ্যাঁ ঠিক হয়েছে যতদিন না ঐ বৈষম্যমূলক আইন তোলা হচ্ছে, ততদিন প্রতিবাদ চলবে।"

মেরী বলল, "সে আবার কি? আইন কি কখনও পাল্টায়? আবহমান কাল ধরে চলে আসছে এই নিয়ম। পাল্টাও বললেই হল?"

ড্যানী উত্তেজিত হয়ে বলল, "ওটাই আমাদের দোষ। আমরা সবকিছু মেনে নিই বলেই সাদারা ভাবে আমরা ভালোই আছি। প্রতিবাদ না করলে, জোর না করলে অধিকাংশ লোক তার সুবিধা ছেড়ে দ্যায় না। সবাই দেবদূত নয়। সমাবেশে ঠিক হয়েছে যে আমরা তিনটে দাবী নিয়ে লড়ব। এক, আমাদের সাথে বাসে সম্মানজনক ব্যবহার করতে হবে। দুই, বাসে যে আগে উঠবে খালি জায়গা পেলে সেই প্রথমে বসবে, তা সে কালোই হোক আর সাদাই হোক। তিন, যে সমস্ত বাসরুট কালো লোকেরা বেশী ব্যবহার করে সে সব রুটের বাসচালক কালো হতে হবে। যতদিন না আমাদের এই দাবী মানা হচ্ছে, ততদিন আমরা বাস বর্জন করব। মন্টগোমারী উন্নয়ন পরিষদ বলে একটা সমিতি তৈরী হয়েছে। এই সমিতিই আন্দোলনের নেতৃত্ব দেবে।"

উইলমা আর মেরী চুপ করে ড্যানীর কথা শুনছিল। নিঃস্তব্ধতা ভঙ্গ করে উইলমা বলল "আমি প্রস্তুত। আমরা অনেক সহ্য করেছি। এখন প্রতিবাদের সময়। ভগবানের কাছে প্রার্থনা করি আমরা যেন এক হতে পারি।"

শুরু হল প্রতিবাদ, সম্মান আদায় করার আন্দোলন। উচ্চতর চেতনায় উত্তরণের আন্দোলন। নেতা ডঃ মার্টিন লুথার কিং (জুনিয়ার)। দিন যায় মাস শেষ হয় কিন্তু কালো মানুষগুলো শ্রান্ত হয় না। তারা শান্তভাবে মাথা উঁচু করে হেঁটে চলেছে দিনের পর দিন, মাসের পর মাস। শীতের হিমেল হাওয়া উপেক্ষা করে, বর্ষার জলের ঝাপটা উপেক্ষা করে ওরা হেঁটে চলেছে। স্বতঃস্ফূর্তভাবে আন্দোলনের ঢেউ আছড়ে পড়ছে আমেরিকার সব প্রান্তে, শহরের সাদা অধিকর্তারা আন্দোলন ভাঙার চেষ্টা করলেন অনেক। আন্দোলন ভাঙার চিরাচরিত প্রথা যেমন ভয় দেখানো, মারধোর করা, হত্যা কিছুই বাদ গেল না। ডঃ কিং এর বাড়ীতে বোমাও ফেলল কিছু দুষ্কৃতকারী। কিন্তু কালা মানুষগুলোকে দমানো গেল না কিছুতেই। উল্টে এই আন্দোলন বেশ কিছু শ্বেতাঙ্গের চেতনায় নাড়া দিল, তারা সত্যের পথ বেছে নিলেন। বাস বর্জন সমর্থন করে এগিয়ে এলেন টেক্সাসের পাদরী গ্লেন স্মাইলী, মন্টগোমারীর পাদরী রবার্ট গ্রেটৎস প্রমুখ বহু শ্বেতাঙ্গ মানুষ। সত্যপ্রতিষ্ঠার আন্দোলন বর্ণবৈষম্য প্রথায় ফাটল ধরাল।

শীতের প্রকোপ অনেক কমেছে। চারমাস ধরে হেঁটে বাড়ী ফিরে, চার-পাঁচমাইল হাঁটা অভ্যেস হয়ে গিয়েছে উইলমাদের। এমন একদিন অনেকের সাথে হলেও একাই হাঁটছিল উইলমা। বান্ধীবী বার্ব অসুস্থতার জন্য কাজে আসতে পারেনি। পথ চলতে অনেকের সাথে আলাপও হয়েছে উইলমার। কে কোথায় থাকে মোটামুটি জানা হয়ে গেছে তার। পাশ থেকে এক ভদ্রলোক উইলমার দিকে তাকিয়ে বলল, "কি আজ একা দেখেছি? বান্ধবীটি কোথায়?"

ভদ্রলোককে আগে দেখেছে উইলমা। ওদের বাড়ী থেকে আধমাইল আগেই একা রাস্তায় ঢোকেন। রোজই একাই হাঁটেন। "হ্যাঁ, আজ একাই। বার্ব, মানে আমার বান্ধবীর জ্বর হয়েছে।"

"আমি প্রায়ই আপনাদের দেখি। আপনারা আমার থেকে দূরে কোথায় থাকেন।"

"হ্যাঁ আধমাইল মতো দূরে।"

"খেয়াল করেছেন দেখছি।"

একটু লজ্জা পেয়ে উইলমা বললে, "আপনি একা হাঁটেন তাই নজরে পড়েছে, এই আর কি।"

"আমার নাম মাইক। মাইক অটো।"

"আমি উইলমা জনসন"

"আমি নিক্স বরগারে কাজ করি। বছর দুই হল কাজে ঢুকেছি। আপনি কোথায় কাজ করেন?"

"আমি একটা দর্জীর দোকানে কাজ করি। দোকানটা বড় রাস্তার ওপরে নয়। একটু ভেতরের দিকে।"

"যাক্ ভালোই হল, এবার থেকে জামাকাপড় সেলাই করবার একটা চেনা দোকান পাওয়া গেল।"

ছোট ঢোক গিলে উইলমা বলল, "মানে আমি ঠিক দর্জীর কাজ করি না এখনও, ছোট-খাট ফাইফরমাস খাটি। মাঝে মাঝে এক আধটা জামা কাটতে দেয়।"

"সময় লাগবে। প্রথমেই কি আর দর্জী হওয়া যায়। শেখাবে, পড়াবে তারপর তো বড় কাজ দেবে। তারওপর চামড়ার রঙের জন্য বড় কাজ পেতে সময় তো একটু বেশী লাগবেই।"

সেদিন কথা বলতে বলতে কোথায় দিয়ে যে সময় কেটে গেল তা দু'জনের কেউই বুঝতে পারল না। মাইকের বাড়ী এসে যাওয়ায় বলল, "আজ তাহলে চলি, কাল দেখা হবে আশা করি।"

"হ্যাঁ আমি প্রায় একই সময়ে কাজ থেকে বেরোই।"

পরের দিন দোকান থেকে বেরিয়ে উইলমার দোকানের গলির সামনে আসতেই মাইক দেখতে পেল উইলমা একটু তাড়াতাড়ি হেঁটে আসছে। ওকে দেখে উইলমা একটা খুশীর হাসি হাসল।

মাইক— "আজও একা দেখছি।"

"হ্যাঁ বার্ব-এর জ্বরটা কমেনি। এরকম আর দু'-তিন দিন হলে চাকরীটা যাবে।"

একটু শ্লেষের সুরে মাইক বলল, "হ্যাঁ তা তো যাবেই। আমাদের অসুস্থ হওয়াও ঘোরতর অপরাধ।"

"দুপুরে ওর দোকানের মালিকের কাছে গিয়েছিলাম। বার্বই বলেছিল দোকানে একটা খবর দিতে।"

"কোথায় কাজ করে আপনার বন্ধু?"

"ঐ যে বড় রাস্তার ওপর ম্যাকস্ বলে একটা জামাকাপড়ের দোকান আছে সেখানে। মালিক তো রেগে আছে। বলল 'বাস বর্জন করলে তো এসব হবেই। রোজ হেঁটেই ঠাণ্ডাটি লেগেছে। বলে দিও আর দুদিন দেখবো। তারপর নতুন লোক নেবো। ভাবচি বার্বকে বলব, ট্যাক্সি করে বাড়ী ফিরতে। খরচ হয়ত হবে, তবে কাজটা থাকবে।"

কিছুক্ষণ হাঁটার পর মাইক বলল, "চার মাস তো হল। আর কদ্দিন বাস বর্জন চালাতে হবে কে জানে। ব্যাটারাতো আমাদের দাবী মানবে বলে মনে হচ্ছে না।"

"পরিষদ তো কেন্দ্রীয় কোর্টে মামলা করবে বলে শুনছি।"

"হ্যাঁ তাই তো শুনলাম।"

"হাঁটা অভ্যেস হয়ে গিয়েছে আমার। ভালোই লাগে গল্প করতে করতে হাঁটতে।"

"হ্যাঁ তা অবশ্য ঠিক। তবে গরম পড়লে অসুবিধা বেশী হবে মনে হয়।"

"তা হোক। গরমের জ্বালা সহ্য করা যায়, কিন্তু অপমানের জ্বালা অসহ্য লাগে

আমার। ডঃ কিং এত কিছুর মধ্যেও আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছেন। আর আমরা না হয় একটু কষ্ট করে হাঁটলামই।"

"কথাটা ঠিকই বলেছেন। ওর বাড়ীতে বোমা মেরিছিল রাগী ছোকরার দল। তাতেও দমানো যায়নি। সাহসী লোক, কি বলেন?"

কথায় কথায় বাড়ী এসে যাওয়ায় মাইক বিদায় নিল। উইলমা বাড়ী ফিরতেই মেরী ছুটে এসে বললেন "তুই একাই এলি? বার্ব কাজে যায়নি শুনলাম।"

"একা কোথায় মা, রাস্তায় তো জনস্রোত। সবাই হাঁটছে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে। আমি তো একা নই।"

"কে জানে বাপু কবে এসব শেষ হবে। এসব গণ্ডগোলের চোটে আমার একটা বাড়ীর কাজ যাবে মনে হচ্ছে।"

" কেন? কি হল?"

"ঐ যে চৌরাস্তার মোড়ে লেস্টার বুড়োবুড়ির বাড়ী। ওদের সাথে একটু জোর গলায় কথা বলা হয়ে গেছে আজ।"

"কি হয়েছিল?"

"আরে ওরা নিজেদের মধ্যে বাস বর্জন নিয়ে কথা বলছিল। আমার তো কোনও অস্তিত্ব নেই ওদের কাছে। টেবিল চেয়ারের সমান আর কি। কথায় কথায় বুড়ো, বুড়িকে বলল. 'নিগাররা আবার মানুষ নাকি যে বাসে বসবে। বাসে চাপতে পারছে এই যথেষ্ট।" কথাগুলো শুনে আমার একটু রাগই হল। আগে এসব ধরনের কথা মুখ বুজে শুনতাম। আজ কেমন সাহস এল মনে। বললাম, "তোমাদের মতো আমরাও মানুষ বুঝলে। তোমাদের কাটলে যেমন রক্ত পড়ে আমাদের কাটলেও তেমনি রক্ত পড়ে।" শুনে বুড়ো দাঁত মুখ খিঁচিয়ে রে রে করে উঠল "ওঃ সাহস বাড়ছে দেখছি। বাবুদের কথা শুনছ। কথার মধ্যে কথা বলছ? নতুন লোক দেখতে হবে। বছর কুড়ি আগে হলে চাবকে সোজা করে দিতাম। আমার মনে হয় কাউকে পেলেই আমাকে ছাড়িয়ে দেবে। তখন কি হবে?" কথা বলতে বলতে মেরীর গলা ধরে এল।

"কি আর হবে। ঐ বাড়ীর কাজ গেলে কি না খেয়ে মরবে। আমি তো কাজ করছি। জাত তুলে গালাগালি দেওয়ার দিন চলে গেছে। আমাদের ধৈর্য্যের সীমা পেরিয়ে যাচ্ছে। হঠাৎ দেখবে আগুন জ্বলে উঠবে।"

"আমারও তাই ভয় হয়। মার দাঙ্গা শুরু হলে আমরা কি বাঁচব? কে জানে বাপু কোনটা ঠিক, এই প্রতিবাদ, না মুখ বুজে সহ্য করা।" মেরীর কথার মাঝেই ড্যানী ঘরে ঢুকল।

মুখ বুজে সহ্য করার দিন চলে গেছে। যতদিন না বাসে বসার সমান অধিকার হচ্ছে ততদিন এই আন্দোলন চলবে। দরকার হলে সারা বছর হেঁটে যাবো আমরা।"

মন্টগোমারী শহর কর্তৃপক্ষ আদালতে একটি মামলা দায়ের করলেন। অভিযোগ করা হল যে ট্যাক্সি চালকদের বাসের মতো ভাড়া নিয়ে ট্যাক্সিতে যাত্রী তোলা আইন বিরুদ্ধ। এই মামলা দায়ের করার মাস খানেক পরে এক শনিবার দুপুরে মাইক এল উইলিয়মদের বাড়ীতে। ড্যানী তখন দুপুরের খাওয়ার শেষ করে কফি খাচ্ছে। উইলমা গিয়েছে বার্বের সাথে গল্প করতে। মাইকের সাথে উইলমাদের পরিবারের পরিচয় হয়ে গিয়েছে ততদিনে। মাইকের সাথে উইলমার সম্পর্ক যে আর নিছক পথ চলতি বন্ধুত্ব নয়, তা এ বাড়ীর সবাই জানে। মেরীর ভালোই লাগে ছেলেটিকে। মাইক একদম একা, বাবা বহুদিন নিরুদ্দেশ। কিছুদিন আগে মা মারা গেছেন। ভাই বোন বলতে কেউ নেই। ফলে মাইকের ওপর একটা মায়া পড়ে গেছে মেরীর। মাইককে দেখে ড্যানী খুবই খুশি হল, "আরে এসো এসো মাইক। একটু দেরী করে ফেললে। খাওয়া তো শেষ হল কিছুক্ষণ আগে। দেখি মাকে বলি তোমায় কিছু করে দিতে পারে কিনা।"

"না না আমি খেয়েই এসেছি।"

"ও, তাহলে একটু কফি খাও।"

কফি খেতে খেতে মাইক বলল, "শহর কর্তৃপক্ষ যদি ট্যাক্সির মামলাটা জেতে তবে এই বাস বর্জন আন্দোলন টেকানো মুশকিল হবে।"

ড্যানী চিন্তিত হয়ে বলল— "হুঁ"।

"আমি ভাবছি আর একটু সক্রিয় ভাবে আন্দোলনে নামবো। সেদিন একটা ঘরোয়া আলোচনার সময় ডঃ কিং বললেন, অনেক টাকা পয়সা আর স্বেচ্ছাসেবকের প্রয়োজন। ভাবছি দিনের বেলায় পরিষদের হয়ে কাজ করব। আর হোটেলে দুটো-দশটা চাকরি করবো।"

"সে তো ভালোই, তবে রাতে ফিরবে কি করে? অত রাতে একা হেঁটে ফেরার কথা ভেবো না কিন্তু।"

"না আমার সাথে কাজ করে গ্যারী তার গাড়ী আছে। ও আমাকে পৌছে দেবে।"

"ও তো সাদা।"

"তাতে কি। ওকে আমাদের দলের লোকই বলতে পারো। ভয়ে মুখে কিছু বলে না।"

"কি জানি বাপু। সব সময় সবাইকে বিশ্বাস করতে পারি না।"

ইতিমধ্যে মেরী এসে মাইককে দেখে বললেন, "কি বাবা খাওয়া হয়েছে?"

"হ্যাঁ। খেয়েই বেরিয়েছি বাড়ী থেকে।"

"তাহলে রাতে এখানেই খেয়ে যেও। উইলমা একটা কেক করবে বলেছে।" ড্যানীর দিকে তাকিয়ে বললেন, "আমি ওপাড়ার টিমদের বাড়ী যাচ্ছি। কাপড়গুলো দিয়ে আসতে, উইলমা এলে বলিস হেরিক বাবুদের কাপড়গুলো ইস্তিরী করে রাখতে, সন্ধ্যের আগেই দিতে হবে বলেছে।"

ড্যানী—"তোমার ধিঙ্গী মেয়ে গেল কোথায়? মাইক আসবে জানে না?"

কিছুদিন পরে মাইক দিনের কাজ ছেড়ে রাতের কাজ নিল। দিনের বেলায় পরিষদের হয়ে স্বেচ্ছাসেবকের কাজ শুরু করল। ফলে আগের মতো উইলমার সাথে রোজ বিকেলে আর দেখা হয় না। মাইককে স্বেচ্ছাসেবক হতে উৎসাহ জুগিয়েছিলো উইলমাই ;"সবাই একটু করে কাজ করলে কাজটা এগোবে তাড়াতাড়ি। আমি তো পরিষদকে টাকা ছাড়া কিছুই দিতে পারব না। তবে শনি রবি ইস্তাহার বিলি করার দরকার হলে বোলো কিন্তু।"

"হ্যাঁ যে যতটা পারে ততটা করলেই ভালো। সামনের নভেম্বরে ট্যাক্সিচালকদের বিরুদ্ধে আনা মামলা শুরু হবে। এদিকে দেশের সর্বোচ্চ আদালতের (সুপ্রীম কোর্ট) বাস বর্জন মামলার কোনও রায় এখনও এল না, ডঃ কিং একটু বেশী চিন্তিত হয়ে পড়েছেন। এগারো মাস হতে চলল এই বাস বর্জন আন্দোলন। কেউ কেউ অধৈর্য হয়ে উঠেছে। একটু ইতস্তঃত হয়ে বলল—

"আমরা কি শেষমেষ হেরে যাবো?"

এক শনিবার উইলমাদের বাড়ীর কাছে একটি পার্কে বসে কথা হচ্ছিল দু'জনার। উইলমা একটু জোর দিয়ে বলল "না, তা কক্ষনই হবে না, দেখে নিও। আমি রোজ ভগবানের কাছে প্রার্থনা করছি। যেন আমরা জিতি।"

"কে জানে তোমার প্রার্থনা ভগবান শুনবেন কিনা। যদি আমরা হারি তবে কালোদের আর কখনও মাথা তুলে দাঁড়াতে হবে না। আর আমরা যারা পরিষদের সাথে যুক্ত তাদের শ্বেতাঙ্গরা তো পেটাবেই, কালোরাও ছেড়ে কথা বলবে না।"

উইলমার মুখে আশংকার ছায়া দেখা দিল, সে তাড়াতাড়ি মাইকের মুখে হাত দিয়ে চুপ করাতে চাইল— "যত সব অলুক্ষণে কথা। জানো আমার মন বলছে আমরা জিতবই।"

প্রসঙ্গ পাল্টাবার জন্য উইলমা বলল, "চলো একটু ভুট্টার খৈ খাবো। তোমার ক্ষিদে পায়নি? সেই কোন্ দুপুরে খেয়েছ।"

উইলমা একটু জোর করেই শ্রান্ত চিন্তিত মাইককে দোকানের দিকে নিয়ে গেল। ওরা দু'জনে ঠিক করেছিল যে আন্দোলন চলাকালীন বিয়ে করবে না। কারণ প্রত্যক্ষভাবে আন্দোলনে যোগ দেওয়াতে মাইককে দিনরাত পরিশ্রম করতে হচ্ছিল।

১৩ই নভেম্বর ১৯৫৬। ঐ দিন ট্যাক্সি চালকদের বিরুদ্ধে আনা শহর কর্তৃপক্ষের মামলার শুনানী শুরু হল। আদালতে দর্শকের আসনে একদিকে পরিষদের সমর্থকরা বসেছেন। অধিকাংশই কৃষ্ণাঙ্গ তবে বেশ কিছু শ্বেতাঙ্গও আন্দোলনে পরিষদের সমর্থক দলে। অন্যদিকে শহর কর্তৃপক্ষও তাদের সমর্থকরা সবাই শ্বেতাঙ্গ। প্রথম দিকের সারিতে বসে ডঃ কিং মন দিয়ে শহর কর্তৃপক্ষের উকিলের বক্তব্য শুনছেন। উপস্থিত সবাই মামলার ফল কোন্‌দিকে যায় তা নিয়ে চিন্তিত। শহর কর্তৃপক্ষের বক্তব্য শুনে মাইকের মনে হতে

লাগল তারা হেরেই যাবে। ডঃ কিং-এর চোখ মুখেও আশংকার ছায়া। গতিক সুবিধার নয় মনে হচ্ছে মাইকের। এমন সময় কোর্টের পেছন দিকে একটু চাঞ্চল্য দেখা দিল, মাইক দেখল একজন সাংবাদিক এক টুকরো কাগজে কিছু লিখে নিয়ে সামনের দিকে এগিয়ে এসে কাগজের টুকরোটা ডঃ কিং এর হাতে দিলেন। মাইক স্পষ্ট দেখতে পেল যে কাগজের লেখা পড়ে ডঃ কিং এর মুখে হাসি ফুটল। মাইক বুঝলো নিশ্চয় কোনও সুসংবাদ, হাসিমুখে ডঃ কিং কাগজের টুকরোটা পরিষদ পক্ষের উকিলকে দিলেন। লেখা পড়ে ঐ উকিলের মুখেও হাসি দেখা দিল।

শহর কর্তৃপক্ষের উকিল তার বক্তব্য শেষ করতেই, পরিষদের উকিল ঝটতি উঠে বললেন "মাননীয় বিচারক, আমার কাছে এইমাত্র একটি খবর এসে পৌঁছেছে যা জানার পর শহর কর্তৃপক্ষের আনা মামলাটি আপনার কাছে মূল্যহীন বলে মনে হবে।"

বিচারক একটু ঝুঁকে প্রশ্ন করলেন—"কি সেই খবর?"

"আপনি হয়ত জানেন যে আমরা দেশের সর্বোচ্চ আদালতে বাসে শ্বেতাঙ্গদের আসন সংরক্ষণ এর বিরোধিতা করে একটি মামলা দায়ের করেছিলাম। আমরা এইমাত্র খবর পেয়েছি যে ঐ আদালত এই বর্ণবৈষম্যমূলক আইনকে সংবিধান-বিরোধী বলে ঘোষণা করেছেন।"

এই কথা শোনার পর আদালতে উপস্থিত পরিষদের সবার মুখে বিজয়ের হাসি ফুটে উঠল। মাইক খবর শুনে ছুটে বেরিয়ে গেল এই সুসংবাদ উইলমাকে জানাতে। দোকানের সামনে এসে একটু দূরে কর্মরতা উইলমারকে উদ্দেশ্যে বলল, "উইলমা, আমরা জিতে গেছি, দেশের সর্ব্বোচ্চ আদালত রায় দিয়েছে বাসে বসার আইন সংবিধান বিরোধী।"

দোকানের মালিক ও কর্মচারীরা সবাই একসাথে বলে উঠলো— "সত্যিই।"

হাঁফাতে হাঁফাতে মাইক বলল। "আমি এখানকার আদালত থেকে আসছি। এক সাংবাদিক খবরটা ডঃ কিংকে জানাতে উনি আমাদের উকিলকে সুংসবাদ দিলেন। তারপর আমাদের উকিল এখানকার বিচারককে কথাটা বললেন।"

দোকানের শ্বেতাঙ্গ মালিক একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বললেন "যাক্ এতদিনে একটা ঝঞ্ঝাট মিটল। বাসে আলাদা বসার ব্যাপারে আমার সমর্থন কোনও দিনই ছিল না। ভাড়া যখন একই দিচ্ছে তখন ফয়দাও একই হওয়া উচিৎ। যাক্ ভালোই হল।"

"উইলমা আমি চলি, কাল তোমাদের বাড়ী যাবো।"

"তাহলে কি আমরা কাল থেকেই বাসে চাপবো"—জনৈক কর্মচারী প্রশ্ন করল মাইককে।

"ঠিক বলতে পারছি না, তবে সম্ভবতঃ না। কারণ শহর কর্তৃপক্ষ যতদিন না আইন পাল্টাচ্ছে ততদিন বাস বর্জন চালিয়ে যেতে হবে। তবে আশা করি খুব তাড়াতাড়িই সবকিছু ফায়সালা হয়ে যাবে।"

অবশেষে, ১৯৫৬র ২১শে ডিসেম্বর মন্টগোমরীর বাসে বর্ণবৈষম্যমূলক আসন সংরক্ষণ উঠে গেল। এই বিজয়কে জনসমক্ষে প্রতিষ্ঠিত করতে ঐ দিন একটি বাসে উঠলেন এই আন্দোলনের নেতা কৃষ্ণাঙ্গ ডঃ কিং ও আন্দোলনের সমর্থক শ্বেতাঙ্গ গ্লেন স্মাইলি, বাসে ওরা প্রথম সারিতে পাশাপাশি বসলেন। শুরু হল আমেরিকার ইতিহসের এক নতুন অধ্যায়। শ্রীমতী রোজা পার্কস যে আন্দোলনের শুরু করেছিলেন দীর্ঘ ৩৮১ দিন পরে তা সাফল্য লাভ করল।

উইলমাদের বাড়ীতে দিনটা বিশেষ খুশীর দিন। একে তো আন্দোলন চলাকালীন সবার মনেই একটা আতঙ্ক ছিল। কালোদের মারধোর করার ঘটনা প্রায়ই শোনা যেত। ফলে মেরী খুবই উৎকণ্ঠায় থাকত, বিশেষ করে ড্যানীর জন্য। তাছাড়া বাড়ীর বড় ছেলে বব আর মেয়ে উইলমার বিয়ের অনুষ্ঠান করার আয়োজন করা যাবে। আন্দোলন চলাকালীন বব ক্যাথী বলে একটি মেয়ের সাথে পরিচিত হয় এবং ওরা বিয়ে করবে বলে স্থির করে। ২৫শে ডিসেম্বর বড়দিনের উৎসবে মেরী অনেককে নেমতন্ন করা মনস্থ করল। ঠিক হল জানুয়ারীর প্রথম দিকে ববের বিয়ে হবে আর শেষের দিকে বিয়ে হবে উইলমারের।

বিয়ের পরে আলাদা বাসা ভাড়া করে বব ক্যাথীকে নিয়ে ঘর বাঁধালো। বব চলে যেতে মেরীর বাড়ী ফাঁকা লাগতে লাগলো। কিছুদিন পরে উইলমাও চলে যাবে। ছেলে মেয়েদের বিয়েতে আনন্দ আর দুঃখ যেন হাত ধরাধরি করে দেখা দেয়। এই আসন্ন দুঃখের কথা ভেবে মেরী মাঝে মাঝে উদাস হয়ে যায়। কিন্তু তখন কি মেরী জানত যে এর থেকেও বড় শোক তার জীবনে আসছে?

আন্দোলন শেষ হতে মাইক কাজের সময় পাল্টে সকাল ছটা থেকে দুপুর দুটো অবধি করে নেয়। সাইকেল করে যাতায়াত শুরু করে মাইক, কারণ অত সকালে বাস পাওয়া মুশকিল। একদিন কাজ সেরে বাড়ী ফিরছিল মাইক, এমন সময় একটা লরী এসে ধাক্কা দেয় ওকে, ধাক্কার ফলে প্রায় দশহাত দূরে রাস্তার উল্টোদিকে ছিটকে পড়ে মাইক, অন্যদিক থেকে আসা একটা ট্যাক্সি প্রাণপণ ব্রেক করেও থামতে পারেনি। মাইকের গায়ের ওপর দিয়ে ট্যাক্সিটা চলে গেল। একটু দূরে গিয়ে ট্যাক্সি দাঁড়াল কিন্তু ধাক্কা মেরে ততক্ষণে উধাও হয়ে গেছে। আশে পাশের লোকজন ছুটে আসে। প্রত্যক্ষদর্শীরা বলল— 'দোষ আসলে ট্রাক ড্রাইভারের।' কেউ কেউ বলল শ্বেতাঙ্গ ট্রাক চালক ইচ্ছে করেই ধাক্কা দিয়েছে মাইককে। পরিষদের কর্মী বলে অনেকেই মাইককে চিনতো। ফলে এই দুর্ঘটনার খবর ছড়িয়ে পড়তে দেরী হল না।

মাইকের রক্তাক্ত অচৈতন্য দেহ যখন হাসপাতালে এল তখন সে আর ইহলোকে নেই। ঘণ্টা দুয়েক পরে উইলমা খবর পেয়েই, এক সহকর্মীকে নিয়ে হাসপাতালে ছুটে এল। মাইকের কোনও আত্মীয় স্বজন না থাকায়, পরিষদের কর্তা ব্যক্তিদের অনুরোধে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ মাইকের নিথর দেহ উইলমারের হাতে দিতে রাজী হল। খবর পেয়ে

ড্যানী বাড়ি গিয়ে মেরীকে নিয়ে এল হাসপাতালে। ঠিক হল মৃতদেহ রাতে হাসপাতালের মর্গে থাকবে। পরের দিন কবর দেওয়া হবে কৃষ্ণাঙ্গদের জন্য নির্দিষ্ট স্থানীয় কবরখানায়। হাসপাতাল থেকে সবার বাড়ী ফিরতে প্রায় রাত নটা বাজল। সবাই শোকাচ্ছন্ন। মেরী কাঁদছে অঝোর ধারায় কিন্তু উইলমারের চোখে জল নেই। সে যেন পাথর হয়ে গেছে। চোখের দৃষ্টি উদাস, নিশ্চুপ বোবা মেয়ে যেন।

বার্ব বলল "তুই কাঁদ উইলমা, না হলে পাগল হয়ে যাবি।" এ কথার কোনও জবাব দিল না উইলমা। ক্যাথী মুষড়ে পড়লেও সবদিক সামাল দেওয়ার চেষ্টা করে চলল। কিন্তু উইলমাকে সান্ত্বনা দেওয়ার কোনও ভাষা খুঁজে পেল না সে।

পরের দিন দুপুর নাগাদ মরদেহ কবরস্থানে নিয়ে যাওয়া হল। শোকযাত্রার সময় অনেকে নিগ্রো স্পিরিচুয়াল গান (অনেকটা মৃতদেহ সৎকারে নিয়ে যাওয়ার সময় কীর্ত্তন গাওয়ার মতো) গাইতে গাইতে চলল। বাড়ী থেকে বেরিয়ে কবরস্থানে আসা অবধি উইলমা একটা কথাও বলেনি, একটুও কাঁদেনি। আসার আগে অনেক পীড়াপিড়ি করে সকলে মিলে ওকে একটু কফি খাইয়েছিল। কফিনটি কবরে নামিয়ে মাটি দেওয়া শুরু হল যখন, তখন হঠাৎ 'মাই-ক' বলে চীৎকার করে কবরের দিকে ছুটে গেল উইলমা। ড্যানী সঙ্গে সঙ্গে জাপটে না ধরলে কবরের মধ্যে লাফিয়ে পড়ত হয়ত। তারপর শুরু হল অঝোর ধারায় কান্না। উইলমারের এই কান্না বাড়ীতে এসেও থামতে চায় না। বার্ব ওকে অনেকক্ষণ ধরে সান্ত্বনা দিয়ে রাত দশটা নাগাদ এক টুকরো কেক খাওয়ালো। ওর মনও ভারাক্রান্ত। দুই বন্ধুতে বসে কথা বলতে বলতে কখন রাত কেটে গেল তা দু'জনের কেউই বুঝতে পারল না। কথায় কথায় উইলমা বলল "মাইকের কাজ অসম্পূর্ণ থেকে গেছে। ওর আদর্শকে আমি বাঁচিয়ে রাখব। কৃষ্ণাঙ্গদের সম-অধিকাররের দাবীর আন্দোলনে আমি যোগ দেব।"

কিন্তু কোনও কাজে আর উৎসাহ পায় না উইলমা, অনেকবার বলা সত্ত্বেও সেই দর্জির দোকানের কাজে ফিরে যায়নি উইলমা। এসময় হঠাৎই মেরীর এক মাসতুতো দাদা টিম বেড়াতে এলেন ওদের বাড়ী। উইলমার অবস্থা দেখে টিম মেরীকে বলল "তুই আর উইলমা এখানকার বাস তুলে আমার সাথে চিকাগো চল। পরিবর্তন হলে হয়ত উইলমার মনটা ঠিক হয়ে যাবে। গোটা জীবন পড়ে আছে, এভাবে চললে তো ও পাগল হয়ে যাবে।"

"কথাটা ভালোই বলেছিস। তবে থাকবো কোথায়, খাবো কি?"

" কেন আমার বাসায়, আমার অবশ্য একটাই ঘর তোদের কষ্ট হবে। তবে আপাতত চলে যাবে। বড় শহর, একটু চেষ্টা করলে কাজও পেয়ে যাবি।"

প্রস্তাবটা উইলমার খারাপ লাগলো না। এ শহর আর একদম ভালো লাগছে না উইলমারের।

মেরীর মাসতুতো দাদা টিম শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ে ঝাড়ুদারের কাজ করেন। চিকাগোর দক্ষিণে হাইড পার্কে থাকেন উনি, বাসার থেকে কাজের জায়গা কাছেই, টিমের বাবাও ঐ একই কাজ করতেন। বাবা হঠাৎ টাইফ্রয়েডে মারা যাওয়ায় অফিসের অধিকর্তা ষ্টুয়ার্টসাহেব টিমকে কাজটা দেন। টিমের বয়স যখন কুড়ি বছর তখনই ওর মা মারা যান। ওর অন্য দু' ভাই ডেট্রয়টে মোটর কারখানায় কাজ করেন। মার্থা, টিমের স্ত্রী, কাজ করতো ঐ এলাকার একটি খাওয়ার দোকানে, টিমের বয়স যখন পঞ্চাশ তখন মার্থা মারা যান ক্যান্সারে। টিম শান্ত প্রকৃতির ভাবুক ধরনের মানুষ। মার্থা মারা যাওয়ায় টিম ভীষণ মনমরা হয়ে পড়েন। সোম থেকে শুক্র তবুও কেটে যায় কিন্তু শনি রবি আর কাটতে চায় না।

এক শনিবার টিম কাছের একটি পার্কের বেঞ্চীতে উদাস মনে বসে আছে এমন সময় হঠাৎ পাশের থেকে বিদেশী গলায় একজন বলল কি এত ভাবছ? কিসের দুঃখ তোমার?"

চমকে মাথা তুলে টিম দেখে গেরুয়া আলখাল্লা পরা মুণ্ডিত মস্তক এক বিদেশী। একটু চমকে উঠে টিম ভাবল সে ঘুমের ঘোরে স্বপ্ন দেখেছে। হাতে চিমটি কেটে দেখলো সে জেগে। হেসে বিদেশী বললেন, "তুমি জেগেই আছ। আমিও তোমার মত রক্তমাংসের মানুষ, আমি কাছেই থাকি। আগেও একদিন তোমাকে দেখেছি এখানে চুপচাপ বসে থাকতে।"

সেই থেকে আলাপ। টিম ক্রমে তার জীবন কাহিনী, তার আশা নিরাশা, দুঃখের গল্প করেন বিদেশীকে, কথায় কথায় টিম জানতে পারে উনি সন্ন্যাসী, নাম আপাতানন্দ। চিকাগো বৈদিক সমিতি পরিচালিত মন্দিরের অধ্যক্ষ। টিম মাঝে মাঝে মন্দিরে যেতে শুরু করেন।

চিকাগোতে মামার বাড়ীতে এসে উইলমার মনটা একটু হাল্কা হল। চিকাগো আসার দিন সাতেক পরে উইলমার মিশিগান হ্রদের পাড়ে বেড়াতে গেল। রাস্তায় আসতে আসতে টিম বললেন "বিরাট হ্রদ, সমুদ্রের মতো। সমুদ্র দেখেছিস কখনও?"

উইলমা মাথা নেড়ে জানালো 'না'। শুনেছে ওদের মন্টগোমারী শহর থেকে মেক্সিকো উপসাগর দেড়শো মাইল দূরে। কিন্তু যাওয়া হয়নি কখনও, উইলমারের দুটো বিরাট তফাৎ চোখে পড়ল চিকাগোয়। এক, এখানে বাসে যেখানে খুশি বসা যায়। দুই, কিছু কৃষ্ণাঙ্গ লোককে দেখে মনে হয় বড়লোক। লেকের পাড়ে হাঁটতে হাঁটতে টিম বলল "এখানে অনেক কিছু দেখার আছে। সব দেখাবো আস্তে আস্তে। তবে আজ সন্ধ্যেবেলায় একটা মন্দিরে নিয়ে যাবো তোদের, ওখানকার স্বামীজীর সাথে তোদের আলাপ করিয়ে দেবো, খুব ভালো লোক।"

"মামা, তোমার অর্দ্ধেক কথা বুঝছি না। মন্দির, স্বামীজী এসব কথার অর্থ কি?"

"হ্যাঁ, হ্যাঁ ভুলটা আমারই। মন্দির হচ্ছে হিন্দুদের চার্চ আর চার্চের পাদরীকে ওরা বলে স্বামীজী।"

"তুই কি হিন্দু ধর্ম নিয়েছিস? আমাদের বলিস নি তো," মেরী একটু অভিযোগের সুরেই কথাগুলো বলল।

"না না আমি ক্রিশ্চানই আছি ;ও এক অদ্ভুত চার্চ আর অদ্ভুত ধর্ম। ওদের মধ্যে ধর্মান্তরের ব্যাপারটা নেই। তোর যদি ইচ্ছে হয় তো স্বামীজীর বক্তৃতা শুনতে যাবি বা ওদের প্রার্থনা সভায় যেতে পারিস। তোর ইচ্ছে হলে পয়সা দিবি। কেউ কখনও তোর কাছে পয়সা চাইবে না। সব চেয়ে মজার কথা স্বামীজীকে কখনই বলতে শুনিনি যে ওদের দেবতার কাছে প্রার্থনা করলেই শুধু স্বর্গে যাওয়া যায়। আরও আশ্চর্য লেগেছিল যখন স্বামীজী বললেন যিশুও অবতার।"

"সেকিরে। তাহলে ধর্মটা কি? একটা তো কিছু বলবে, এই কর, ঐ কর, এটা পাপ ওটা পুণ্য।

"ওদের উপনিষদ বলে, ধর্মের একটা বই আছে তাতে নাকি পাপ বলে কোনও কথাই নেই, আর নরক বলে কোনও জায়গার উল্লেখ নেই।"

"নরকের ভয় না দেখালে তো লোকে সব আজে বাজে কাজ করে বেড়াবে। স্বর্গ, নরক, ভগবান, শয়তান এসব ছাড়া কি ধর্ম হয়?"

"হয়ত হয়, ওরা তো বলে সত্যকে জানাই ধর্মের উদ্দেশ্য। যার যেমন সুবিধা সে সেই পথ বেছে নেবে, ওদের শেষ কথা হচ্ছে সব কিছুর মধ্যে ভগবানকে দেখা। এই বালি, বেঞ্চি, সমুদ্র, তুই, আমি সবকিছুর মধ্যে।"

"যত্ত সব উদ্ভট কথা। এই জন্যই শুনেছি ওদের লাখ লাখ দেবতা, ওদের নাকি মেয়ে দেবতাও আছে। ওরা প্যাগান, মূর্তি পুজো করে। "শ্লেষ মেশানো গলায় কথাগুলো বলে মেরী।"

"আমিও তাই জানতাম, তবে ওসব প্রতীক, ওদের সব কথা বুঝি না বাপু, তবে ওরা সব ধর্মকেই মানে। ওদের মন্দিরে বিভিন্ন ধমের প্রতীক আছে।"

"সত্যি, মানে আমাদের ক্রশও আছে?" অবাক হয়ে প্রশ্ন করল উইলমা।

"হ্যাঁ তাও আছে। বললাম তো এক অদ্ভুত ধর্ম। ওদের যখন উৎসব হয় তখন আবার সবাইকে পাত পেড়ে খেতে দেয়। বেশ ঝাল মশলা দেওয়া খাওয়ার।"

"এ্যাঁ চিকেন কারি? আমার এক বন্ধু খেয়েছিল কোথায় যেন। খেতে নাকি দারুণ।" উইলমার গলায় উৎসাহের সুর।

"না ওখানে মাংস, টাংস হয়না, সবই নিরামিষ খাওয়ার। খেতে খুব ভালো। তবে খাওয়ার জন্য নয়, ওখানে তোদের এমনিই ভালো লাগবে।"

সন্ধ্যের কিছু আগেই টিম, উইলমা ও মেরী হাইড পার্কের বৈদিক সমিতির মন্দিরে এল। উইলমা দেখল দু' একজন প্রার্থনা ঘরে বসে। ঘরটা বেশ বড়। সামনে একটা উঁচু বেদীর ওপরে অনেক ছবি রাখা আছে। ফুল দিয়ে সুন্দরভাবে সাজানো বেদীটি। বেদীর

থেকে একটু দূরে একটা কাঠের বড় ফ্রেমের মতো, যা বেদীকে প্রার্থনা ঘর থেকে আলাদা করেছে। কাঠের ফ্রেমের ওপর দিকটায় অনেক প্রতীক চিহ্ন আছে। খেয়াল করে দেখল ক্রুশও আছে। প্রার্থনা ঘরের সামনের দিকটা কিছুটা ফাঁকা, তারপরেই চেয়ার পাতা, এক কোণে বক্তৃতা দেওয়ার জন্য কাঠের উঁচু টেবিল আর মাইক। খুব আস্তে একটা গান বাজছে, সম্ভবত টেপ রেকর্ডারে। গানের কথা কিছুই বুঝছে না উইলমা তবে সুরটা ভালোই লাগছে। সুন্দর একটা গন্ধ ঘরটাতে। খুবই শান্ত পরিবেশ, উইলমা মনে মনে বলল, "মামা ঠিকই বলেছে, এখানে ঢুকেই মনটা খুবই ভালো লাগছে, হাল্কা মনে হচ্ছে। বিশ্রামের পক্ষে জায়গাটা খুবই উপযোগী।" একটু এদিক ওদিক দেখে উইলমা একটা চেয়ার নিয়ে বসল। টিম সামনের ফাঁকা জায়গায় কিছুক্ষণ নতজানু হয়ে বসে মাটিতে, মাথা ঠেকালেন। উইলমা বুঝল এখানে প্রার্থনা করার এটাই রীতি। কিছুক্ষণ পরে টিম বেরিয়ে আসার সময় উইলমাকে ইশারা করে বেরিয়ে আসতে বললেন। মেরী প্রথমে প্রার্থনা ঘরে ঢুকে একটু দেখে বাইরের বেঞ্চিতে গিয়ে বসেছিলেন। মেরীর কাছে এসে টিম বললেন, "চল দেখি স্বামীজী আছেন কিনা, প্রার্থনার আগে অবশ্য খুব একটা কথা বলেন না।"

সেদিন স্বামীজী মঠেই ছিলেন। প্রার্থনার সময় দেখতে পেল উইলমা। প্রার্থনার সুর খুব ঢিমে তালে। অতক্ষণ ধরে বসে থাকতে ঠিক ধৈর্য্য থাকছিল না উইলমারের; তবে মামা বসে আছে বলে বসেই থাকল। প্রার্থনা ঘরে মহিলা ও পুরুষ মিলিয়ে প্রায় জনা কুড়ি মতো উপস্থিত ছিলেন, প্রার্থনা শেষে এক এক করে সবাই বেরিয়ে আসতে লাগলেন। উইলমা বেরিয়ে দেখল দরজার পাশে একটা টেবিলের ওপর থালায় করে কিছু কাটা ফল, কিসমিস, কাজুবাদাম ইত্যাদি রাখা আছে। সবাই বেরিয়ে ওখান থেকে একটু কিছু নিয়ে খাচ্ছে। দু' একজন বাড়ীর ভেতরে গেলেন, অধিকাংশ লোকই বাইরে বেরিয়ে গেলেন। কিছুক্ষণ পরে স্বামীজী ও একজন পাশের সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠতে লাগলেন। ওরা যে সিঁড়ির কাছে সোফায় বসে তা স্বামীজী খেয়াল করলেন বলে মনে হল না। একটু পরে টিম সে বলল "চ' ওপরে যাবো, স্বামীজীর সাথে দেখা করে আসি।"

মেরী— "তোরা যা, আমি এখানেই বসে থাকছি। বেশী দেরী করিস না যেন।"

টিম, উইলমাকে নিয়ে ওপরে উঠতে যাবে এমন সময় উইলমা ফলের থালা দেখিয়ে টিমকে বলল— "মামা, ঐ থালায় খাওয়ার যে কেউ খেতে পারে? কিসমিস দেখে লোভ হচ্ছে।"

"হ্যাঁ খা। ওটাকে এরা প্রসাদ বলে, ওরা ভগবানকে মানুষের মতোই ভাবে। তাই এসব খেতে দেয়। ভগবানের প্রসাদ যে কেউ ইচ্ছে হলেই খেতে পারে। কোনও বাধা নেই।"

ওপরের বারান্দায় গিয়ে দেখল স্বামীজী একটা সোফায় একা চোখ বুজে টেপ রেকডারের গান শুনছেন, ওদের পায়ের শব্দে চোখ খুললেন। টিম হাতজোড় করে নমস্কার

করলেন। মামার দেখাদেখি উইলমাও নমস্কার করল। স্বামীজী এক হাত একটু তুলে বললেন— "মঙ্গল হোক। বোসো। প্রসাদ খেয়েছ টিম? এটি কে?"

"আমার ভাগ্নি। দিদিও এসেছে তবে নীচেই বসে আছে। সপ্তাহ খানেক হল এসেছে। লেকের পাড়ে বেড়াতে নিয়ে গিয়েছিলাম। ওখান থেকেই আসছি।"

"ও তাহলে তো ক্লান্ত। হরি এদের একটু কফি, কেক এসব দাও, নীচে যিনি আছেন তাকেও দিও।" স্বামীজী পাশে দাঁড়ানো একজনকে উদ্দেশ্য করে বললেন।

হরি ও টিম কফি আনতে গেলেন; স্বামীজী উইলমাকে জিজ্ঞেস করলেন "কোথায় থাকো তোমরা?"

"মন্টগোমারী, অ্যালাবামা।"

"ও বাবা সে তো খুব নামকরা জায়গা গো এখন। তোমার কাছে অনেক গল্প শোনা যাবে তাহলে।"

একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে উইলমা বলল "হ্যাঁ ঘটনা আছে আবার দুর্ঘটনাও আছে।"

"হ্যাঁ মা জীবনে ভালোও আছে, মন্দও আছে। তোমরা একটা অন্যায়ের প্রতিবাদ অহিংস ভাবে করে সফল হয়েছো জেনে খুব ভালো লাগছিল। জানো আমাদের দেশেও এরকম একজন অহিংস আন্দোলন করেছিলেন বৃটিশদের বিরুদ্ধে।"

"ও, তা তো জানি না।"

"তার নাম মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী। সবাই তাকে গান্ধীজী বলে। আমি তাকে দেখেছি।"

"আমাদের নেতার নাম ডঃ মার্টিন লুথার কিং জুনিয়ার। তিনিও অহিংস আন্দোলনের কথাই বলেন। আমার কিন্তু শ্বেতাঙ্গদের ওপর ভীষণ রাগ, ওদের জন্যই আজ আমার জীবনটা ছারখার হয়ে গেল।" একটু রেগেই শেষের কথাগুলো বলল উইলমা।

"কি জান মা, হিংসা, বিদ্বেষ সব মানুষের মধ্যেই থাকে। এসব জয় করাই কষ্ট। তবে কি জান বিদ্বেষ মানুষকে ভগবানের থেকে দূরে সরিয়ে দেয়। যার মনে বিদ্বেষ যত বেশী সে ভগবান থেকে তত দূরে। মনে বিদ্বেষ পুষে রেখে যতই প্রার্থনা কর, পুজো পাঠ কর। কিছুই লাভ হবে না।"

"তবে কি শত্রুর সাথে গলা জড়িয়ে গল্প করব?" শ্লেষের সাথে বলল উইলমা।

"না তা নয় অন্যায়কে মেনে নেওয়া কাপুরুষতা। প্রতিবাদ নিশ্চয় করতে হবে। তবে মতের অমিল হলেই যে হাতাহাতি করতে হবে তা নয়। যতটা সম্ভব অহিংসার মধ্যে দিয়েই সমস্যার সমাধান করার চেষ্টা করতে হয়। তবে এমন কিছু সময় বা পরিবেশ আসে যখন হাতিয়ার ধরতেই হয়। তবে কি জান ভালোবাসা শত্রুকেও মিত্র বানাতে পারে। যিশু অনন্ত ভালোবাসার প্রতীক।"

"হয় তো বা। তবে আমি এখন ভীষণ ভাবে শ্বেতাঙ্গ বিদ্বেষী।"

ইতিমধ্যে কফি, কেক, বিস্কুট নিয়ে হরি ও টিম বারান্দায় এল। স্বামীজী বললেন "নাও কফি খাও। টিম তোমার দিদিকে কফি দিয়েছো?"

"হ্যাঁ"

"হরি এদের খাওয়ার ব্যবস্থা করো, তোমরা খেয়ে যেও।"

"না থাক আজ নয়, অন্য একদিন হবে। সারাদিন ঘুরে দিদি ক্লান্ত।"

"ঠিক আছে পরে এসো। সামনের মঙ্গলবার এসো না হয় সেদিন আমার গুরুদেবের জন্মোৎসব, এখানে সন্ধ্যেবেলায় প্রসাদ নিও।"

কফি খেয়ে সেদিনকার মতো উইলমার বিদায় নিল। বাড়ী ফিরে যেতে যেতে উইলমার বলল, "মামা স্বামীজীর একটা কথা আমার খুব আশ্চর্য্য লাগলো।"

"কি কথা?"

"উনি বললেন যিশু অনন্ত ভালোবাসার প্রতীক, বললেন না তো তোমাদের যিশু। যিশু কি ওদেরও দেবতা?"

একটু হেসে টিম বলল, "বললাম তো ওদের মতটা বড় অদ্ভুত। ওরা লাখো লাখো দেবতা মানে, আমার মনে হয় সে জন্য আরও একটা দেবতা মানতে ওদের অসুবিধা হয় না। প্রশ্নটা তুই ওকেই করিস, দেখ কি উত্তর দেন।"

এসব হিন্দু ধর্ম নিয়ে কথাবার্তা মেরীর ভালো লাগছিল না তবে উইলমার মনমরা ভাবটা কাটছে দেখে মেরী খুশিই হল।

টিম— "সামনের রবিবারে ওখানে স্বামীজী বক্তৃতা দেবেন, শুনতে যাবি?"

মেরী— "তুই রবিবারে চার্চে যাস না?"

"অধিকাংশ রবিবারেই যাই। তবে যে রবিবার স্বামীজী নিজে বলেন সেদিন মঠেই যাই। প্রত্যেক রবিবারেই ওখানে কেউ না কেউ বক্তৃতা দেয়।"

"তোরা ওখানে যেতে চাস যা, আমি চার্চে যাবো। বাড়ীর পেছনের দিকের ঐ চার্চটা কি কৃষ্ণাঙ্গদের?"

"হ্যাঁ, ওখানকার পাদরী গর্ডন এ্যাডমস্ কৃষ্ণাঙ্গ। আমার সঙ্গে আলাপ আছে।"

উইলমা— "মামা আমি যাবো তোমার সাথে। তোমাকে যখন এতদিন মাথা মুড়োতে হয়নি তখন আমিও পার পেয়ে যাবো, ঠিক কিনা মা।"

টিম হেসে উঠল, মেরী বলল— "কি জানি বাপু অতশত বুঝি না। রবিবারে চার্চে যাওয়া অভ্যাস, সেটাই করব।"

রবিবারে চার্চের পাদরীর সাথে মেরীর আলাপ করিয়ে দিয়ে উইলমা ও টিম গেল বৈদিক মঠে স্বামীজীর বক্তৃতা শুনতে। প্রার্থনা ঘরেই বক্তৃতা হয়, শ্রোতার সংখ্যা আগের দিনের থেকে একটু বেশী। ভারতীয় ছাড়াও কিছু শ্বেতাঙ্গ ও কৃষ্ণাঙ্গ ভদ্রলোক ভদ্রমহিলাকেও উপস্থিত দেখতে পেল উইলমা।

স্বামীজী বক্তৃতা শুরু করলেন ঠিক সকাল দশটায়, উইলমা লক্ষ্য করল ঘন্টা দেড়েক বক্তৃতা দিলেন উনি, কিন্তু কোনও কাগজ দেখে নয়। মনে হল কথাগুলো মনের ভেতর থেকে বেরিয়ে আসছে। ভালোই লাগল উইলমারের। বক্তৃতার শেষে অনেকে প্রশ্ন করল। উইলমারও ইচ্ছে হল কিছু প্রশ্ন করার কিন্তু সাহস করে প্রশ্ন করে উঠতে পারল না। বক্তৃতার পরে স্বামীজীর কাছে গেল টিম আর উইলমা। স্বামীজী বললেন "তোমরা খেয়ে যেও।"

উইলমা "আমার কিছু প্রশ্ন ছিল।"

"ঠিক আছে খেয়ে এসো। তারপর কথা হবে।"

খেতে গিয়ে উইলমা একটু নিরাশই হল। দেখল ভারতীয় খাওয়ার কিছুই নেই, টিমকে বলতে বলল "নারে পাগলী সবদিন ওসব খাবার থাকে না, উৎসবের দিনে ওসব খাবার থাকে।"

খেয়ে ওপরে স্বামীজীর কাছে গিয়ে বসতেই উইলমাকে বললেন "বল কি তোমার প্রশ্ন?"

"না থাক্। ভেবে দেখলাম আমার প্রশ্ন শুনলে আপনি হাসবেন।"

"তাহলে অনেকের প্রশ্নেই আমাকে হাসতে হয়। তুমি নির্ভয়ে বল কি তোমার প্রশ্ন।"

"বক্তৃতার সময় আপনি বললেন যে সবার জীবনের একটা বিশেষ লক্ষ্য থাকা দরকার। তা চাকরী বাকরী করে নিজের জীবন চালাতে পারলেই তো হল, হাতে কিছু উদ্বৃত্ত পয়সা থাকে তো সিনেমা দ্যাখো, বেড়াতে যাও, এসব করে, হৈ হুল্লোড় করে আনন্দের সাথে জীবন কাটালেই তো হল। হৈ চৈ করে, হুল্লোড় করে জীবন কাটাতে পারা ছাড়া আর কি লক্ষ্য হতে পারে?"

"তাহলে তোমার সাথে পশুর তফাৎ কোথায়?"

"মানুষ তো এক হিসেবেই পশুই। তবে পশুরা কলকারাখানায় কাজ করতে পারে না, ইচ্ছে মতো রান্নাবান্না করে ভালোমন্দ খেতে পারে না, যা খেতে পেল তা খেয়েই সন্তুষ্ট থাকতে হয়। মানুষের মতো ইচ্ছে মতো ঘুরতে পারে না, ঠাণ্ডায় কষ্ট পায়।"

"তাহলে বুঝছ তো পশুর সাথে মানুষের একটা তফাৎ আছে। মানুষ এক হিসেবে পশু বটে তবে সে পশু থেকে আলাদাও বটে। ঠিক কিনা, তুমি তো তাই বললে?"

উইলমা একটু ভেবে বলল— "হ্যাঁ, আপনি ঠিকই বলেছেন যে মানুষ পশুর থেকে আলাদা, তবে শুধু তফাৎ হচ্ছে মানুষের বুদ্ধি আছে পশুর বুদ্ধি নেই।"

"পশুর একদম বুদ্ধি নেই বলা চলে না। কুকুরের বুদ্ধির অনেক গল্প আছে। শিম্পাঞ্জীর বুদ্ধি বেশ ভালোই। সার্কাসে দেখো না জন্তু জানোয়ারেরা কত খেলা দেখায়। বুদ্ধি যদি একদম না থাকে তবে খেলা কি দেখাতে পারত? তুমিই বল?"

"না, মানে হ্যাঁ তা ঠিক। তবে মানুষের মন আছে পশুদের মন নেই"

"না আমাকে আবার এক কথাই বলতে হচ্ছে। মন একদম নেই বলা যাবে না। কুকুররা শুনেছি মনিব বাইরে গেলে দুঃখে অনেক সময় খাওয়াই বন্ধ করে দেয় ;গরুরা নিজের বাচ্চা মারা গেলে দুধ দেওয়া বন্ধ করে দেয় বা কমে যায়। বাচ্চাকে খোঁজে। এরকম অনেক উদাহরণ আছে। তফাৎ হচ্ছে জীব জগতে মানুষের অন্তরাত্মাই সবচেয়ে বেশী বিকশিত। যার অন্তরাত্মা যত বিকশিত সে তত উন্নত মানুষ। তবে এই উন্নতি বলতে শুধু ব্যবহারিক জগতের উন্নতি নয়, আত্মিক জগতের উন্নতি বা সামগ্রিক উন্নতি বোঝায়।"

"অন্তরাত্মা কি?"

"আমাদের যেমন বাইরের শরীর যা আমরা দেখতে পাই। তেমনি ধর ভেতরে আর একটা শরীর আছে যা অনুভব করা যায়। কিন্তু ঠিক ছোঁয়া যায় না। একটু খেয়াল করলে তার অস্তিত্ব সম্বন্ধে অনুভূতি হয়। একেই বলে অন্তরাত্মা যা চারটে জিনিসের সমষ্টি বলতে পার। বুদ্ধি, মন, অহং আর চিত্ত।'

"বুদ্ধি আর মন তো বুঝলাম, অহং আর চিত্ত কি?"

"চিত্ত হচ্ছে স্মৃতির আধার। যার চিত্ত যত শুদ্ধ সে তত তথ্য মনে রাখতে পারে। চিত্ত একদম শুদ্ধ হলে সে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডব্যাপী যে স্মৃতি আছে, যাকে আমরা মহাস্মৃতি বলি, তার স্পর্শ পায়, তুমি এটা এখন ঠিক বুঝবে না। তবে সোজা কথায় বলতে গেলে চিত্ত যত শুদ্ধ হবে তোমার স্মৃতিশক্তি তত বাড়বে। আর অহং হচ্ছে তাই, যা বহিরঙ্গ বা স্থূল শরীর আর অন্তরাত্মাকে একসাথে ধরে রাখে। বলতে গেলে অহং আছে বলে আমাদের কাছে জীব জগতের অস্তিত্ব আছে। জীবের মধ্যে মানুষের অহং সবচেয়ে বেশি। আমাদের এক মহাপুরুষ, যাকে অনেকে অবতার বলে মানে, নাম তাঁর শ্রীরামকৃষ্ণ। তিনি বলতেন যার মান সম্বন্ধে হুঁশ আছে সেই মানুষ। অহংশূন্য মানুষ হয় পশুর মতো না হয় ব্রহ্মজ্ঞ মহাযোগী। একটা কুকুরকে তুমি লাঠি পেটা কর, সে যন্ত্রণায় কুঁই কুঁই করে পালিয়ে যাবে। পরমুহূর্তে তাকে খেতে দাও, সে ঠিক খেয়ে নেবে, অধিকাংশ মানুষের মধ্যে এ ধরনের আচরণ তুমি দেখতে পারবে না। ঐ যে ফুলটা দেখছ, ওর বোঁটা হচ্ছে অহং এর মতো। ঐ বোঁটাটাই ফুলকে ধরে রেখেছে। বোঁটা ছিড়ে ফেল ফুলটাও ঝরে যাবে। বোঁটা ছাড়া ফুলের বিকাশও সম্ভব নয়। অহং চলে গেলে অন্তরাত্মা ঐরকম বিশ্বআত্মায় বা ব্রহ্মে বিলীন হয়ে যায়।"

"তার মানে মৃত্যু হয়।"

"না আত্মার জন্মও নেই মৃত্যুও নেই। গরমকালে এ পাড়ার বাচ্চারা দেখেছি লেবুর সরবৎ বিক্রী করে। অবশ্য বিক্রী করে যে খুব একটা পয়সা হয় তা আমার মনে হয় না।" "আমরাও করেছি। খুব মজার। বিক্রী করে হয়ত দলের সবার একটা করে হ্যামবারগার খাওয়ার পয়সা ওঠে, সেটাই বিরাট লাভ। ওকে বলে লেমনেড।"

"হ্যাঁ, হ্যাঁ লেমনেড। ঐ লেমনেড তুমি যদি আরও চিনি দিয়ে গোলো তো চিনিটা

সরবতে মিশে যাবে তাই না?”

“হ্যাঁ, ঠিক”

“চিনির দানাগুলোর কিন্তু মৃত্যু হল না। ওদের স্বকীয় অস্তিত্ব আর থাকল না। সরবতের সাথে মিশে গেল বা বিলীন হয়ে গেল। অহংশূন্য হলে ঐ রকম আত্মা বিশ্বআত্মায় বিলীন হয়ে যায়। তবে অবিকশিত অহং পশুত্বের সমান। আগে অহংকে বিকশিত করতে হবে। তারপর তা ক্ষয়ের প্রশ্ন। আগে মানুষ হতে হবে তারপরে যোগী হওয়া”।

“বাঃ আপনার কথাগুলো খুব ভালো লাগল, তার মানে আগে মানুষ হতে হবে, আগে মান সম্বন্ধে হুঁশ আনতে হবে, তাই তো?”

“‘হ্যাঁ, দেখ এই পৃথিবীতে তিনটে জিনিস পাওয়া খুব কঠিন, এক হচ্ছে মানুষ হয়ে জন্মানো, দুই কোনও মহাপুরুষের সান্নিধ্য লাভ করা আর তিন মনে মুক্তি লাভ করার ইচ্ছে জাগা। এই দুর্লভ মানুষ-জন্ম যখন পেয়েছ তখন একটা কিছু কর। পড়াশুনা, গান, বাজনা, খেলাধুলো, পরোপকার যা তোমার পছন্দ ও সামর্থের মধ্যে তা করে দেখাও। আমাদের দেশে তুলসীদাস বলে এক বিরাট সাধুপুরুষ ছিলেন, তিনি মানুষকে উদ্বুদ্ধ করার জন্য অনেক ছোট ছোট কবিতা লিখেছিলেন। তার একটা হচ্ছে—

“যব তুম আও সব হাসে
এইসা কাম করযা তুলসী
যব তুম যাও সব রোয়ে।”

মানে হচ্ছে তুমি যখন জন্মেছিলে তখন সবাই আনন্দে হেসেছিল, এমন কাজ করে যাও যাতে তোমার মৃত্যুতে লোকে কাঁদে। তেমন কিছু কর। শুধু পৃথিবীতে এলে, খেলে দেলে মরে গেলে, তাতে কার কি? ওতো পশুরাও করে। মানুষের মতো মানুষ হও। ‘ওঠো জাগো লক্ষ্যে না পৌঁছানো অবধি এগিয়ে চল।’ কথা বলতে বলতে স্বামীজীর গলা ধরে এল।

উইলমা কিছু বলতে যাচ্ছিল। তাকে বাধা দিয়ে টিম বলল “স্বামীজী আপনি বিশ্রাম করুন। আমরা চলি। অন্য একদিন আসবো আপনার কাছে গল্প শুনতে।” স্বামীজীকে পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করল টিম। ওর দেখাদেখি উইলমাও প্রণাম করল স্বামীজীকে।

স্বামীজীর কথা খুব ভালো লেগেছিল উইলমার। মানুষের মতো মানুষ হওয়ার স্বপ্ন পেয়ে বসল উইলমাকে। মাইকের মৃত্যুর শোক অনেকটা কমলেও তার আদর্শ মুছে যায় নি উইলমারের মন থেকে। কৃষ্ণাঙ্গদের সমান অধিকার লড়াই-এ মাইকের সামিল হওয়ার ইচ্ছে ছিল উইলমারের। কিন্তু মাইকের মৃত্যুতে তা কেমন দিশাহারা হয়ে গিয়েছিল। আবার সে ইচ্ছা প্রবল হতে থাকল উইলমার। পড়াশুনা শুরু করার ইচ্ছে জানাল মামাকে। টিম ওকে চার্চের নৈশস্কুলে ভর্তি করিয়ে দিল। উইলমারের স্বপ্ন ছিল বিভিন্ন দেশের ইতিহাস জানার, বিশেষ করে আফ্রিকার দেশগুলোর। মায়ের কাছে শুনেছিল যে ওদের

পূর্বপুরুষদের নাকি কঙ্গো থেকে ধরে আনা হয়েছিল, তাই সে সব তথ্য জানার খুব ইচ্ছে ছিল উইলমারের। এদিকে মামার আয়ের ওপর নির্ভর করে জীবন কাটাতে উইলমার ভালো লাগছিল না। তাই মাস খানেক পরে একদিন মাকে বলল "মা অনেকদিন তো হল। এবারে একটা কাজ জোগাড় করার চেষ্টা করি। মামার একার ওপর খুব চাপ পড়ছে।"

কথাটা মেরীর খুব ভালো লাগলো, মেয়ে যে আবার শোক ভুলে স্বাভাবিক হচ্ছে এটা তারই লক্ষণ। তাছাড়া মেরীরও ইচ্ছে সে একটা কিছু কাজ করে, টিমকে কথাটা বলাতে সেও ওদের চাকরির খোঁজ করতে লাগলো। চিকাগো শহরে চাকরি পাওয়া সোজা নয়। তার ওপর কৃষ্ণাঙ্গ এবং শিক্ষার অভাব থাকায় বাধাও আরও বেশী। সারাদিন চাকরী খুঁজে দিনের শেষে হতাশ হয়ে বাড়ী ফিরত দুজনেই, তবে উইলমা রাতে চার্চের স্কুলে যাওয়া ছাড়ল না।

কিছুদিন পরে মেরী বিশ্ববিদ্যালয়ের কাছে একটা খাওয়ার দোকানে বাসন ধোয়ার কাজ পেল। সপ্তাহে ২৫-৩০ ঘন্টার কাজ, তবে পেট চালানোর পক্ষে আয়টা যথেষ্ট। উইলমারের ভাগ্যে চাকরি আর জোটে না দেখে টিম একদিন ওকে বলল "এ পাড়ায় চাকরি পাওয়া মুশকিল। তুই বাসে করে শহরের মধ্যে যা, ওখানে হয়ত চাকরী পেতে পারিস।"

মামার কথামতো পরের দিন উইলমা আর্ট মিউজিয়ামের কাছে বাস থেকে নামল চাকরি খুঁজতে। যে দোকানেই 'লোক চাই' বিজ্ঞাপন দেখে সেখানেই গিয়ে খোঁজ করে। প্রায় দুপুর নাগাদ একটি 'ড্রাই ক্লিনিং' এর দোকানে কাজ পেয়ে গেল, জামা কাপড় ইস্ত্রি করার কাজ। দোকানটা বড়ই। চার পাঁচ জন কাজ করে, দুজন কৃষ্ণাঙ্গ মহিলা কর্মী আছেন দেখে উইলমা আশ্বস্ত হল। সকাল নটা থেকে বিকেল সাড়ে পাঁচটা অবধি কাজ, শনি রবি ছুটি। মালিক বলল সেদিনই কাজ শুরু করতে। কাজ সেরে উইলমা যখন বাড়ী ফিরল তখন সন্ধ্যে প্রায় সাড়ে ছটা বাজে। উইলমার বাড়ী ফিরতে দেরী দেখে টিম আর মেরী দুজনেই চিন্তিত ছিল, উইলমা ঘরে ঢুকতেই দুজনেই বলল "কিরে এত দেরী?"

"মা, মামা চাকরি পেয়েছি, আর্ট মিউজিয়ামের কাছে একটা দোকানে, জামাকাপড় ইস্ত্রি করার কাজ। ঘণ্টায় দু' ডলার করে মাইনে দেবে এখন। পরে বাড়তে পারে।" হুড়মুড় করে কথাগুলো বলে উইলমা দম নেওয়ার জন্য একটু থামল।

আনন্দে মেরী মেয়েকে জড়িয়ে ধরে বলল "যাক্ এতদিনে তোর একটা হিল্লে হল। দাঁড়া এককাপ কফি করি তোর জন্য। সারাদিন কাজ করে এলি।"

একটু অনুযোগের সুরে টিম বলল "ওঃ শুধু মেয়েই কাজ করে এল। আর আমি বুঝি ঘরে বসে ছিলাম।"

"বাঃ তোকে তো একটু আগেই কফি খাওয়ালাম, আবার কি? বেশী কফি খাস না "একটু ধমকানোর সুরেই কথাগুলো বলল মেরী।

"আচ্ছা তাহলে আধকাপ দাও, এত বড় সুখবর— তোমার মেয়ে চাকরি পেল। তা বলে উলীকে ছাড়ছি না। শুক্রবারে পিৎযা খাবো।"

খুশীতে ডগমগ উইলমা বললল "নিশ্চয়ই খাওয়াবো। মা, খাওয়ার হয়েছে? ক্লাস আছে সাড়ে সাতটা থেকে।"

মেরী "এখন ওসব থাক না কিছুদিন, সারাদিন খেটে খুটে এসে পড়াশুনা করতে পারবি? তাছাড়া চাকরি যখন পেয়েই গেলি তখন আর পড়ার দরকার কি?"

"না মা পড়াশুনা ছাড়ছি না, স্কুল শেষ করে কলেজে পড়ব। ইতিহাস নিয়ে গবেষণা করব।"

চাপা দীর্ঘশ্বাস ফেলে টিম বলল 'সে কি হবে। বিশ্ববিদ্যালয়ে ঢোকা কি মুখের কথা, তার ওপর আমাদের মতো লোকেদের।'

"কেন কালো বলে, আমি লড়াই করব, সমান অধিকারের লড়াই। আমি ছাড়ব না।"

উইলমাকে বাধা দিয়ে টিম বলল "আচ্ছা ঠিক আছে সে দেখা যাবে। এখন তো খেতে বোস। আজ নতুন রান্না করেছি। টেস্কান অ্যাস।"

"এমা সে আবার কি? সারাদিন খেটে এসে তুমি দেবে ছাই খেতে আর তোমাকে খাওয়াবো পিৎযা?"

"নারে, ছাই নয়। গতকাল কিছুটা মাংসের কিমা বেঁচেছিল মনে আছে? চালের সাথে বিন, গাজর সেদ্ধ করে ফ্যান মড়িয়ে তাতে কিমা আর টমাটোর সস দিয়ে গরম করেছি। পরে একটু পেঁয়াজ ভেজে দিয়ে দিয়েছি। লম্বা আলু ভাজার সাথে টেস্কান অ্যাস যা দারুন খেতে না, খেয়ে দেখ পাগলী।

"একটু ইতস্তত করে অল্প একটু মুখে দিয়ে চাখল উইলমা। পরের বার চামচ ভর্তি করে মুখে দিয়ে বলল—

"দা-রু-ণ।" উইলমাকে গব গব করে খেতে মেরী বলল "আস্তে আস্তে খা, গলায় লেগে যাবে। তোরই খাওয়ার, কেউ নেবে না।"

খেয়ে দেয়ে উইলমা ক্লাসে গেল, ফিরল প্রায় রাত সাড়ে নটায়। দিন যায় রাত আসে। উইলমা কাজ আর পড়াশুনা নিয়ে মেতে উঠল, সপ্তান্তে কখনও কখনও বৈদিক মন্দিরে যায়, স্বামীজীর সঙ্গে কথা বলে, প্রার্থনায় যোগ দেয়। মায়ের সাথে প্রতি রবিবার পাড়ার কৃষ্ণাঙ্গদের চার্চেও যায়। ইতিমধ্যে হঠাৎই একদিন ড্যানীর চিঠি এল। উইলমা মেরীকে চিঠি পড়ে শোনাল। ড্যানী জানিয়েছে "প্রায় দু'মাস হল চাকরী গেছে, নতুন করে চাকরি পাওয়া খুব মুশকিল এসময়ে। এখানে থাকবো না ঠিক করেছি। আমার এক বন্ধু নিউইয়র্কে চলে গেছে। ওর কাছেই যাবো ভাবছি। মাস খানেক দেখি যদি কিছু হয়। বব আর ক্যাথীর সাথে দেখা হয় মাঝে মাঝে তবে ওরা আমাকে এড়িয়েই চলে, পাছে ওদের ঘাড়ে চাপি।"

বাড়ী ফিরে উইলমা আর মেরীকে চিন্তিত দেখে টম ওদের জিজ্ঞেস করে জানতে পারল ড্যানীর চিঠির কথা। খেতে বসে টিম বলল "ওকেও এখানে আনলেই ঠিক হত একা ওখানে থাকা ঠিক না, বদমেজাজী ছেলে কখন কি মারদাঙ্গার মধ্যে জড়িয়ে পড়ে ঠিক নেই। একবার চাকরি গেলে কালোদের ও শহরে চাকরি পাওয়া দায়।"

উইলমা উত্তেজিত হয়ে বলল "সেটা তো অন্যায়, এর বিরুদ্ধেই তো আমাদের আন্দোলন।"

টিম "অন্যায় তো বটেই, তবে এটা বন্ধ করাও মুশকিল"

একটু অসহিষ্ণু হয়ে মেরী বলল" আচ্ছা বাবা তোদের তত্ত্বকথা বন্ধ কর তো। ছেলেটাকে নিয়ে কি করি তাই বল। গণ্ডগোলে জড়িয়ে শেষটায় বেঘোরে মারাই পড়বে হয়ত।"

টিম ব্যস্ত হয়ে বলল "না না ওসব আজে বাজে চিন্তা কোরো না।"

"আচ্ছা মামা, ড্যানীকে এখানে আসতে বলি না।"

মেরী "থাকবে কোথায়?"

"কেন তুমি আর আমি তো চাকরি করি। আমরা অন্য একটা বাসা ভাড়া নেবো।"

টিম দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল "আমাকে একা ছেড়ে যাবি? বেশ ছিলাম হৈ চৈ করে।"

উইলমা তাড়াতাড়ি বলল "না কাছাকাছিই থাকবো, তোমার ঘাড় থেকে পুরোপুরি নামছি না। তোমার ঐ ছাইপাঁশ খেতে আসতে হবে তো, তুমি ভাবছ ছাড় পাবে?"

"তা সে কথাই থাক, নীচের তলার একটা বাসা ফাঁকা আছে সেটা ভাড়া নে। আমি টেস্কান ছাই খায়াবো আর তার বদলে তুই পিৎযা খাওয়াবি।"

"ওঃ এরকম একটা সমস্যার মধ্যেও যে তোরা কিভাবে হাসি ঠাট্টা করতে পারিস, বুঝি না বাপু। ছেলেটাকে কি লিখব বলে দে।'

টিম "কেন ঐ যে ঠিক হল। ড্যানী আমার কাছে থাকবে। নীচের বাসায় তোমরা দু'জন থাকবে। আর উইলমা মাঝে মাঝে আমাদের পিৎযা খাওয়াবে।"

"উইলমা তাহলে তাই লিখে দে, নাকি?"

"হ্যাঁ, এখানে এলে কিছু একটা কাজ পেয়ে যাবে।"

চিঠি পাওয়ার কিছু দিনের মধ্যে ড্যানী এসে উঠল চিকাগোর মামার বাসায়। উইলমা আর মেরী নীচের বাসা ভাড়া নিল। দিন কয়েক খোঁজাখুঁজি করে গ্রোহাউণ্ড বাস কোম্পানীতে মাল বওয়া কুলির কাজ পেল ড্যানী। ওখানে কাজ করতে করতে ড্যানীর পুরোনো বন্ধু ফিলের সাথে দেখা হয়ে গেল। ফিলের সূত্রে অন্য এক কৃষ্ণাঙ্গ নেতা ম্যালকম এক্স এর সাথে পরিচয় হল ড্যানীর। ম্যালকম এক্স এর কথা ভালো লাগে ড্যানীর "কৃষ্ণাঙ্গরা যতদিন না ব্যবসা করে বড়লোক হবে, ব্যবসার মালিক হবে, ততদিন এই বর্ণবৈষম্য চলতে থাকবে। চাকরি ছেড়ে ছোটখাট ব্যবসা করাও ভালো।"

ড্যানীর ব্যবসা করার কথা শুনে টিম হেসে উঠল। "ব্যবসা করব বললেই হবে? কত ডলার পুঁজি লাগবে জানিস? আমার তো মনে হয় অন্তত তিরিশ চল্লিশ হাজার।"

"কেন ছোট ব্যবসা দিয়ে শুরু করব। আমরা ঠিক করেছি বিশ্ববিদ্যালয়ের সামনে একটা ছোট হ্যামবারগারের দোকান দেবো।"

"দোকানের ভাড়া, শহর কর্তৃপক্ষের অনুমোদন, দোকানের আসবাবপত্র, ঠাকুরের মাইনে সব মিলে কত লাগবে জানিস?"

"না না বসে খাওয়ার জায়গা থাকবে না। লোকে কিনে নিয়ে যাবে শুধু। তাছাড়া আমি আর ফিলই সব। ঠাকুর বল, দোকানী বল, বাজার সরকার বল সব। একটা জায়গাও দেখা হয়ে গিয়েছে, মিষ্টার ম্যাককারি আমাদের কিছু ধার দেবেন। ও তোমাদের অহিংস-ফহিংস দিয়ে কিছু হবে না। ব্যবসার মালিক হও, টাকার জোর দেখাও তাহলে সাদাদের সাথে টেক্কা দিতে পারবে। না হলে সারাজীবন ঐ গালিগালাজ আর লাথি ঝাঁটা খেয়েই জীবন কাটাতে হবে।"

সবশুনে উইলমা বলল, "— তোদের প্রস্তাবটা খারাপ লাগছে না। আমি সময় পেলে তোদের দোকানে কাজ করব। আমাকে কিন্তু বিনাপয়সায় হ্যামবারগার খাওয়াতে হবে।"

মেরী উইলমাকে ধমক দিলেন, "থাম তো তুই, গাছে কাঁঠাল গোঁফে তেল। দোকানই হল না, উনি বিনে পয়সায় খাওয়ার স্বপ্ন দেখছেন।"

ড্যানীকে বললেন "অতগুলো টাকা ধার নিবি? যদি বিক্রী না হয়, দোকান না চলে?"

ড্যানী "কেন বিক্রি হবে না? ঐ তল্লাটে একটাও খাওয়ার দোকান নেই।"

টিম চিন্তিত গলায় বলল "সাদারা কি তোদের দোকানে খাবে।"

"তা ঠিক, কিছু সাদা আমাদের হাতে খাবে না। তাই বলে সবাই তা নয়। দেখাই যাক্ না কি হয়। অত ভয় ভয় করলে চলে? সাহস করে এগোতে হবে।"

শুরু হল ড্যানী আর ফিলের "লানচ এ্যাণ্ড মান্চ।" মাস কয়েক খুব কম বিক্রী হলেও আস্তে আস্তে দোকান জমে উঠল। সময় পেলেই ফিলের বাবা, জানীর মা মেরী, উইলমা এরা ওদের সাহায্য করতে লাগল। ওদিকে দেশ জুড়ে সমঅধিকারের দাবী নিয়ে কৃষ্ণাঙ্গরা ক্রমাগত আন্দোলন চালিয়ে যেতে লাগলেন। উইলমা সময় সুযোগ মতো এই সব আন্দোলনে যোগ দিত। একদিন এক সহকর্মীর কাছে উইলমা শুনল যে ডঃ মার্টিন লুথার কিং ভারতবর্ষে গিয়েছেন অসহযোগ আন্দোলনের বিষয়ে শিক্ষা ও পরামর্শ নিতে। ওখানে বিমান বন্দরে অভ্যর্থনা জানিয়ে ভারতীয় কর্মকর্তার জানালেন যে "ওঁর ভারত ভ্রমণ এক ঐতিহাসিক ঘটনা।" প্রত্যুত্তরে ডঃ কিং বলেছিলেন "পৃথিবীর অন্যদেশে আমি যাই ভ্রমণকারী হিসেবে, কিন্তু ভারতবর্ষে এসেছি তীর্থযাত্রী হিসেবে।"

দেখতে দেখতে বেশ কয়েক বছর কেটে গেল। ইতিমধ্যে উইলমার জীবনে অনেক দুঃখ আর আনন্দ জমা হল। হঠাৎ এক মোটর দুর্ঘটনায় মারা যান মামা টিম, সেই শোক ভুলতে না ভুলতেই নিউমোনিয়ায় মারা যান মা মেরী। এদিকে ড্যানীদের দোকান বেড়েছে। ফিল্ অন্যজায়গায় একটা শাক্‌সবজীর দোকান করে চলে গেছে। ড্যানীর বিয়ে হয়েছে। বৌ জুলিয়া এখন ড্যানীর সাথে দোকানে কাজ করে। সব কিছুর মধ্যেও পড়াশুনা চালিয়ে গেছে উইলমা। তবে খুব বড় আঘাত পেল সেদিন, যখন পাদরী গর্ডন জানালেন যে চার্চের স্কুলে পড়ে বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার সুযোগ পাওয়া যাবে না। স্কুলে বারো ক্লাস অবধি পড়ে ভালো নম্বর পেলে তবেই বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়া যাবে।

"তাহলে কি হবে? দিনের বেলায় স্কুলে গেলে চাকরী ছাড়তে হবে, চাকরী ছাড়লে খাব কি?"

গর্ডন— "আমি তোমার দুঃখ বুঝি উইলমা, কিন্তু এতো আমার হাতের বাইরে, তুমি যদি স্কুলে পড় তাহলে আমি তোমাকে পড়াশুনা করতে সাহায্য করতে পারি।"

খুব হতাশ মন নিয়ে উইলমা গেল স্বামীজীর সাথে দেখা করতে, সব শুনে স্বামীজী বললেন, "ডিগ্রী না পেতে পার, তবে তোমার জ্ঞান লাভ করা তো কেউ আটকাতে পারে না, যা জানতে চাও তা নিজেই জান।"

"কিন্তু আমার স্বপ্ন ছিল আমি অধ্যাপিকা হব। জ্ঞানীগুণী লোকেদের সাথে বসে আফ্রিকার ইতিহাস নিয়ে আলোচনা করব, গবেষণা করব।" কথা বলতে বলতে বোবা কান্নায় গলা ধরে এল উইলমারের।

"স্বপ্নকে স্বপ্ন করে রেখো না উইলমা, তাকে বাস্তবে রূপায়িত কর। তুমি নিজে না পার আর কাউকে সাহায্য কর। তার মধ্য দিয়ে তোমার স্বপ্ন সার্থক কর। উইলমা, এ সাময়িক পরাজয়। এ পরাজয়ের ক্ষুদ্রতা ডিঙিয়ে যাও। বৃহতের মধ্যে তোমার স্বপ্নকে বাস্তবায়িত কর।"

"তার মানে"

"তোমার আসল স্বপ্ন কৃষ্ণাঙ্গদের সমঅধিকার, সমান সম্মান আদায় করা। সে শুধু তোমার জন্য নয়, সমস্ত কৃষ্ণাঙ্গদের জন্য। আমি মনে করি সমঅধিকার শ্বেতাঙ্গদেরও মঙ্গল আনবে, শরীরের এক অঙ্গ যদি অসুস্থ হয়, তো গোটা শরীরকেই তার যন্ত্রণা ভোগ করতে হয়। দশের ভালো হলেই দেশের ভালো, স্বার্থান্ধ মানুষ কখনই বৃহতের সন্ধান পায় না।" স্বামীজী সুরেলা গলায় বলে উঠলেন সংগচ্ছম্, সংঘবদ্ধং সম্‌বোমনা...

এক অনির্বচনীয় আনন্দে উইলমার মন ভরে উঠল "বাঃ কি সুন্দর। অর্থ বুঝলাম না কিন্তু মন শান্তিতে ভরে উঠল।"

"ঋক্‌বেদের ঐক্যমন্ত্র এটি। সারমর্ম হল ভগবানের উপাসনায় সবাইকে একমনে

সমবেত হতে হয়। বিদ্বেষ ভুলে একতা আনতে হয়। তুমি সত্যাগ্রহ কথাটার অর্থ জানো?"
"হ্যাঁ, মানে হচ্ছে অহিংসভাবে অধিকারের দাবীতে আন্দোলন করা।"

"ওটা আংশিক অর্থ, ব্যবহারিক অর্থ বলতে পার। সত্যাগ্রহ কথাটার অর্থ হচ্ছে সত্যে আগ্রহ। প্রকৃত সত্যাগ্রহ শুধু তোমাকেই সত্যের দিকে নিয়ে যায় না, তোমার শত্রুকেও সত্য উপলব্ধি করতে সাহায্য করে। উভয়পক্ষই যখন সত্য উপলব্ধি করে তখন আর বিদ্বেষ থাকে না। যখন সমগ্র সমাজে সত্য প্রতিষ্ঠিত হয়, তখনই প্রকৃত একতা আসে। সত্যাগ্রহ যখন শুরু করেছ তখন তাকে মাঝপথে ছেড়ো না। কাজ যত বড়, বাধাও তত বড়। শুধুমাত্র নিজের মধ্যে তোমার স্বপ্নকে বেঁধে রেখো না, তাকে ছড়িয়ে দাও। নিজে না পড়াশুনা করতে পার, অন্য কোনও কৃষ্ণাঙ্গকে তার সুযোগ করে দাও। তাকে উচ্চশিক্ষার জন্য অর্থ দিয়ে সাহায্য কর, যাতে সে দশজনের মধ্যে মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে পারে। 'কৃষ্ণাঙ্গমাত্রই বোকা,' শ্বেতাঙ্গদের এই বদ্ধমূল অসত্য ধারণাকে পাল্টে দাও। 'ঠিক ঠিক সুযোগ পেলে জাতি, ধর্ম, বর্ণনির্বিশেষে যে কোনও মহিলা বা পুরুষই বিশ্ববরেণ্য হতে পারে' এই সত্যকে প্রতিষ্ঠা করতে সচেষ্ট হও।"

স্বামীজীর কথায় হতাশার ভাব কেটে যায় উইলমার, উদ্যম ফিরে পায় সে। উইলমা ঠিক করল কোনও একজন কৃষ্ণাঙ্গকে উচ্চশিক্ষার জন্য অর্থ দিয়ে সাহায্য করবে, শুরু হল নিঃশব্দ আন্দোলন, সত্যাগ্রহ। তার মিতব্যয়িতা লোকের দৃষ্টি আকর্ষণ করল। অনেকেই আড়ালে ওকে কৃপণ বলতে শুরু করল। জুলিয়া উইলমাকে খুবই ভালোবাসে। ড্যানীর এই ছোট বোনটির কথাবার্তা তার কাছে দুরবোধ্য হলেও, হাসিখুশি এই মহিলাকে তার ভালো লাগে। একদিন ড্যানী বোনকে 'কিপটে' বলে উল্লেখ করায় জুলিয়া বলল "বেচারী একা। শেষ বয়েসের জন্য এখন থেকে না জামালে কি করে হবে বল? বাচ্চাদের দামী খেলনা দেয়না ঠিকই কিন্তু ও এলে বাচ্চারা একদম খুশীতে ডগমগ হয়ে ওঠে। ওরকম একটা জ্যান্ত খেলনা পেলে কে আর কাঠের খেলনার কথা ভাবে বলো তো?"

দিন এগিয়ে চলে, ইতিমধ্যে সমাজ অনেক পাল্টেছে। সমঅধিকার সংক্রান্ত অনেক আইন কানুন হয়েছে। তবু বাধা অনেক। তার মধ্যে সবচেয়ে বড় বাধা হল অর্থনৈতিক, কথায় কথায় একদিন পাদরী গর্ডন বলল, "দেখ আইনকানুন পাল্টেছে ঠিকই, তবে বিশ্ববিদ্যালয়ের খরচ এত বেশী যে অনেকেই ইচ্ছে থাকলেও উচ্চশিক্ষার দিকে এগোয় না, স্কুল পাশ করেই চাকরী করতে ঢোকে।"

উইলমা বলল, "হ্যাঁ জানি, এ ব্যাপারে একটা কিছু করব ভাবছি।"

"কত আর আন্দোলন করবে, বিয়ে শাদী না করে ঘর সংসারও করলে না, নিজের জীবনই তো উৎসর্গ করে দিয়েছ।"

এ ব্যাপারে কথা না বলে উইলমা ধীরে ধীরে চার্চের যিশুর মূর্তির দিকে এগিয়ে গেল।

দিন কয়েক পরে একদিন স্বামীজীর সাথে দেখা করতে গেল উইলমা, স্বামীজীরও অনেক বয়স হয়েছে। উইলমা প্রণাম করতে স্বামীজী বললেন "থাক মা, ভালো আছ তো?"

"হ্যাঁ স্বামীজী, আমি একটা কাজ করব স্থির করেছি। আপনারা মনে আছে কিনা জানিনা, আজ থেকে প্রায় পঁচিশ বছর আগে সত্যাগ্রহ কথাটার প্রকৃত অর্থ কি তা বুঝিয়ে ছিলেন আমাকে, আমি সেদিন বাড়ী ফিরেই এক সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম। আপনার পরামর্শ মতো আমি ঠিক করেছিলাম যে আমি টাকা জমিয়ে একজন কাউকে পড়ার জন্য সাহায্য করব। আজ আমার সে ক্ষমতা হয়েছে। একটি কৃষ্ণাঙ্গ মেয়েকে বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার খরচ দেবো আমি।"

"খুবই ভালো কথা। আমার খুবই আনন্দ হচ্ছে তোমার এই নিঃশব্দ সাধনা দেখে। দেখ হাজার জন লোকের উৎসাহের সামনে কেউ কেউ বড় ত্যাগ করে। কিন্তু সবার চোখের অন্তরালে নিঃশব্দে কোনও ভালো কাজ করার মাহাত্ম্য অনেক বেশী। তোমার স্বপ্ন তাহলে সার্থক হতে চলেছে। খুব ভালো।"

স্বামীজীকে প্রণাম করে চলে আসে উইলমা। উইলমার পাশের বাসায় থাকে জিনি। বাপ মাতাল, অর্দ্ধেক দিন কাজে যায় না। মা চাকরি করে কোনও রকমে সংসারের হাল ধর আছে। বড় মেয়েটি স্কুলে থাকতেই এক সহপাঠীর সাথে থাকবে বলে বাড়ী ছেড়েছে। জিনি ছোট মেয়ে, পড়াশুনায় ভালো, স্কুলের পড়া শেষ করে আরও পড়াশুনা করার ইচ্ছে। জিনির মাকে প্রস্তাবটি দেয় উইলমা ; বলে— ওর বিশ্ববিদ্যালয়ের পড়ার খরচ দেবে উইলমা। সব শুনে বেশকিছু দিন ভেবে জিনি রাজী হল, বলল— "চাকরী করে পরে তোমার টাকা শোধ দেবো।"

"সে দেখা যাবে এখন।"

জিনি বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হল। পড়াশুনায় খুব উৎসাহ জিনির। উইলমার সহচর্য ও উৎসাহ তাকে আরও মনোযোগী করে তুলল। বছর দুই পরে ভালো ফল করায় বিশ্ববিদ্যালয়ে একটি বৃত্তি পেল জিনি। তাতে বিশ্ববিদ্যালয়ের মাইনে অর্দ্ধেক হয়ে গেল। চারবছর পরে জিনির বাবা মায়ের সাথে উইলমাও গেল জিনির সমাবর্তন উৎসবে, উৎসবের শেষে ডিগ্রী হাতে জিনি এসে দাঁড়াতেই বাবা, মা, উইলমা সবাই জিনিকে উচ্ছ্বসিত অভিনন্দন জানালো, বাবা ও মা দু'জনেই জড়িয়ে ধরল জিনিকে। উইলমা এগিয়ে আসতেই ওর হাত ধরে, ধরা গলায় জিনি বলল "উলিমাসী তোমার ঋণ আমি জীবনে কোনও দিনই শোধ করতে পারব না।" আনন্দে উইলমার চোখে জল চলে এল ; "আমি তোর মধ্যে দিয়ে আমার স্বপ্ন সার্থক হতে দেখেছি জিনি। তাই আমার কাছে তোর কোনও ঋণ নেই, তবে এই শুরু। এখনই থামলে চলবে না, মনে আছে তো বিশ্ববিদ্যালয়ের থেকে শেষে ডিগ্রী তোকে আনতে হবে।"

সবাই মিলে এল ড্যানীর দোকান। দোকানে এখন অনেক বড় হয়েছে। তিরিশ চল্লিশ জন বসে খেতে পারে সে দোকানে, জিনির পাশের খবর শুনে জুলিয়া ওদের খেতে ডেকেছিল। একধারে একটা টেবিল ফুল দিয়ে সাজানো। তাতে মস্ত বড় একটা কেক পাশের টেবিলে হ্যামবারগার, ভুট্টা সেদ্ধ। চীজকেক্ ইত্যাদি অনেক খাওয়ার সাজানো। জিনিরা আসতেই ড্যানী আর জুলিয়া এগিয়ে এসে জিনিকে 'স্বাগতম' জানাল। জুলিয়া বলল "জিনি তোমার জন্য আমরা খুবই গর্বিত। আমি এই প্রথম আমাদের নিকট পরিচিতদের কাউকে বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রী পেতে দেখলাম। আজকের আনন্দ উৎসব সব তোমার জন্য।" সবার হাততালি আর আনন্দ উচ্ছ্বাসের মধ্যে জিনি কেক কাটল। খেতে খেতে জিনি বলল "উলিমাসী, চাকরি না করা অবধি তো তোমার টাকা শোধ দিতে পারব না।"

একটু হেসে উইলমা বলল "উঁহু অত সহজে তোমার ছাড় নেই। আমি যা দিয়েছি তা দিয়েছি। তা আর ফেরৎ চাই না। তবে তোমার ওপর একটা দায়িত্ব দিতে চাই।"

"কি কাজ বল?"

"তোমার মধ্যে একটা প্রদীপ জ্বেলে দিয়েছি আমি, তুমি চেষ্টা কর যাতে এরকম আর একটা প্রদীপ অন্য কাউরির জীবনে জ্বেলে দিতে পার। এইভাবে একটা একটা করে আমরা হাজার হাজার প্রদীপ জ্বালাবো। সেই হাজার হাজার প্রদীপের আলো সমাজ থেকে অন্ধকার দূর করে দেবে। এই ভাবে শুরু। আমাদের লক্ষ্যে পৌছতে হয়ত সময় লাগবে, তবে আমরা থামবো না।"

জুলিয়া নীচুগলায় শুরু করতেই সবাই ওর সাথে গেয়ে উঠল বর্ণবৈষম্য আন্দোলনের জনপ্রিয় গানটি ঃ

আমরা জয়ী হব কোনও একদিন,
আমার মনের গভীরে আমি জানি,
আমরা জয়ী হবো কোনও একদিন,
মিতা সাথে মুক্তপথে (আমরা চলবো) কোনও একদিন,
আমার মনের গভীরে আমি জানি,
আমরা জয়ী হবো কোনও একদিন,
(আমাদের) গৃহ হবে শান্তিনীড় কোনও একদিন,
আমার মনের গভীরে আমি জানি,
আমরা জয়ী হবো কোনও একদিন।
সত্য দেবে মুক্তি আনি কোনও একদিন।
আমার মনের গভীরে আমি জানি,
আমরা জয়ী হবো কোনও একদিন।

বর্ণভেদ দূর করি কোনও একদিন,
আমরা জয়ী হবো কোনও একদিন,
ভীত নই মোরা আজ,
আমার মনের গভীরে আমি জানি,
আমরা জয়ী হবো কোনও একদিন।
নিখিল ভুবন জুড়ে কোনও একদিন,
আমার মনের গভীরে আমি জানি,
আমরা জয়ী হবো কোনও একদিন।

নবাগত

আমি চিরদিনই ছোট শহরে থেকেছি, পড়াশুনাও কলকাতায় করিনি। ফলে বড় শহর আমার কখনই ভালো লাগে না, তাই আমেরিকায় এসে ম্যাডিসনে যখন একটি চাকরী পেলাম, তখন বুঝলাম ভাগ্য সুপ্রসন্ন। শহরটা আমেরিকার খড়্গপুর বা শান্তিনিকেতন বললে ভুল বলা হবে না সবই ভালো তবে অকথ্য ঠাণ্ডা, শীত এলেই মনে হয় পালাই, পালাই। নভেম্বরের শেষ থেকে শুরু করে এপ্রিলের মাঝামাঝি অবধি ঠান্ডা ভালোই থাকে।

আমি উইসকনসিন বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রদের জ্ঞানদানের চেষ্টা করি, স্ত্রী মিলা একটি বেসরকারী সংস্থায় কাজ করেন। ওয়াকেব্যা রোডের ওপর আমাদের বাড়ী। আমাদের বাড়ী থেকে বাজার, পোষ্ট অফিস সব খুবই কাছে। আমেরিকার শহরে এটি একটি দুর্লভ সৌভাগ্য। মিলীর পাড়াতুতো ভাই সুমন পাত্র, উইসকনসিন বিশ্ববিদ্যালয়ে পদার্থবিদ্যায় স্নাতকোত্তর শিক্ষার জন্য আসছে নবাগত সুমন ওরফে বিটুকে নিয়েই এই গল্প। অবশ্য গল্প না বলে একে ঘটনার সংকলন বলাই বোধহয় ঠিক হবে। বিটু এদেশে আসার মাস কয়েক আগে আমরা স্বদেশ ভ্রমণে গিয়েছিলাম। দেশে গেলেই স্ত্রীর পাড়াতুতো দিদি ভুটকিদির বাড়ী একবার ঢুমারি। সিঙ্গারা পিঠেপুলি, পায়েস ইত্যাদিতে ভুটকিদি সিদ্ধহস্ত। ভুটকিদির স্বামী ব্রজদাও আড্ডা জমাতে পারেন ভালোই। এরকম আড্ডায় না গেলে দেশে যাওয়াই বৃথা হয়ে যাবে। ভুটকিদির বাবা মা দুজনেই বেশ কিছু বছর আগে হঠাৎই মারা যান। বিটু তখন ছ' সাত বছরের। ভুটকিদির বিয়ে হয়ে গেছিল এর বছর কয়েক আগেই। নিঃসন্তান ভুটকিদি ও ব্রজেনদা বিটুকেই ছেলের মতোই মানুষ করেছেন। আমরা যখন দেখা করতে গিয়েছি ততদিনে বিটুর ম্যাডিসনে আসা পাকা হয়ে গিয়েছে। মনের মতো লোকাল গার্জেন পেয়ে ভুটকিদি খুব নিশ্চিন্ত। আমি একটু নীচু স্বরে মিলাকে বললাম তুমি ওটা একটু বলে দাও কিন্তু."

ভুটকিদি ভাবলেন আমি আরও পুলি খেতে চাই। "কি হল? পুলি দু'চারটে দেবো আরও।"

মিলা "ওর কথা ছাড়ো। বড্ড বাজে বকে। চাকরি বাকরির ঠিক নেই ফট্ করে বিয়ে দিলেই হল। বিটু ঠিক সামলে নেবে।"

ব্রজেনদা "হ্যাঁ কথাটা যে আমি ভাবিনি তা নয়। তবে ও যে রকম মুখচোরা তাতে প্রণয় হলেও প্রণয় নিবেদন করতে পারবে না। তবে নেহাৎই যদি মেম বিয়ে করে তো সব দেখে শুনেই করবে। তোমরাও একটু খেয়াল রেখো।"

মিলা "ও হরি তোমরা মেম বিয়ের কথা ভাবছ। তবে আমরা যা নিয়ে ভাবছি সেটা একদমই রোম্যান্টিক নয় বুলুদি", তবে কি? বিট্টু মাংসই খায় না তো গরুর মাংস। তাছাড়া আমরা দুজনেই তো জানিস বিবেকানন্দের চেলা। ধর্মকে ভাতের হঁ.ড়িতে ঢাকাই না, গরুর মাংস খেলে কারও জাত যায় তা আমরা মানি না।

অগত্যা আমি ইতস্তত করে বললাম, "ভুট্‌কিদি সমস্যাটা ঐ ভাতের হাঁড়ি নিয়েই, বিট্টু কি রাঁধতে জানে?"

"শোনো জামাই এর কথা। বিট্টু হাত পুড়িয়ে রাঁধতে যাবে কেন? ওদেশের হস্টেলে কি ঠাকুর-চাকরের অভাব আছে?" ভুট্‌কিদি কমতি নয়, ওদেশের হস্টেলে ঠাকুর-চাকর একটাও নেই। নিজেকেই ভাতের জোগাড় করতে হবে।" মিলা ও দেশে বাইরে খেতে প্রচুর খরচ। বৃত্তির যে টাকা পাবে তাতে সামলানো দায়, নিজে না রাঁধলে ঠিক চলে না। তাছাড়া ডাল ভাত পেটে না পড়লে অনেকে ছটফট করে। এদেশের ঠুঁটো জগন্নাথদের নিয়ে এই এক সমস্যা। বিয়ের আগে মায়ের আদরে আর বিয়ের পরে বৌ-এর সেবায় অভ্যস্ত। জলটা পর্যন্ত গড়িয়ে খেতে জানে না।"

প্রতিবাদের সুরে বললাম "তা বলে সবাই তা নয়। চেষ্টা করলে পারে না তা নয়, তবে ঘাড়ে জোয়াল পড়লে সবই করবে। এই দেখ না আমাকে, রান্না যা করি তা মিলাও চেয়ে খায়। চিন্তা কোরো না, বিট্টুকে রান্না আমি শেখাবো।"

ব্রজদা— "এতো মজার ব্যাপার দেখছি, উচ্চশিক্ষার্থে বিদেশ যাত্রার আগে অধীর ঠাকুরের পাঠশালায় হাতা খুন্তি নাড়ার পাঠও নিতে হবে তাহলে।"

ভুট্‌কিদি একটু চিন্তিত মুখে বললেন— "ভাজাভুজি, ডাল না হয় করে দিতে পারবে, ভাতের ফ্যান গালানোই সমস্যা। হাত পোড়ে ওতেই।"

মিলা "না ওটা কিছু নয়। ওখানে বড় এ্যালুমিনিয়ামের বাটি পাওয়া যায়, ঝাঁজরীর মতো; চালসেদ্ধ হলে ফ্যানসুদ্ধ ঢেলে দাও, ফ্যান গলে পড়ে যাবে। তবে সমস্যাটা মাছ ভাজার, ওদেশে বাঙালী ছাত্রছাত্রীরা তাই মাছ খুব একটা খায় না, মাংসই খায় বেশী। সে আমরা দেখবো।"

ব্রজদা "ওগো এবার থেকে বিট্টুকে একটু হেঁসেলে ঢুকতে দিও। একটু-আধটু রাঁধতে জানলে বিয়ের পরেও কাজে দেবে।"

মিলা— "ব্রজদা, দেখুন, যুগ পাল্টাচ্ছে। আমরা মেয়েরা ঘরের কাজ সেরে বাইরে বেরোচ্ছি। আর ছেলেরা কিন্তু এখনও ঘরের কাজে প্রায় হাতই দেয় না, নিয়মিত রান্না তো দূরস্থান। আপনারা, ছেলেরা কিন্তু হেরে যাচ্ছেন।"

এই বিটু, ভুটকিদির কাছে অল্প অল্প রান্না শিখে ম্যাডিসনে উদয় হলো। প্রথম দু'চার দিন আমাদের বাড়ীতেই থাকল বিটু। পছন্দ মতো একটা বাসা দেখে ওর গেরস্থালী গুছিয়ে দিয়ে এলাম আমরা। তার আগে মিলার রন্ধন শিক্ষার পাঠশালায় অষ্টম শ্রেণীর পাঠ সম্পূর্ণ হল, অর্থাৎ ভাত, মুরগীর ঝোল আর দু একটা তরকারী রান্না শিখে গেল বিটু। ওর বাসা থেকে আমাদের বাড়ী একটা বাসেই আসা যায়। সাধারণত সকাল ১০টা ১৫তে বিটুবাবু আমাদের বাসায় আসেন। সেদিনও যথাসময়ে বিটু বেল বাজাল। আমি ততক্ষণে পুজো পাঠ সেরে একরাশ প্রাতরাশ আর চা বানাতে ব্যস্ত। দরজা খুলে বললাম "হাওজদা গইন।"

বিষণ্ণ সুরে বিটু বলল— "এ্যাঁ, হাঁসদা চলে গেলেন?"

আমি ওর প্রশ্নটা বুঝতে না পেরে নির্বাক হয়ে রইলাম। আমায় চুপ করে থাকতে দেখে বিটু একটু দুঃখিত হয়েই বলল "কবে মারা গেলেন, হৃদরোগ না ক্যান্সার?" কথাগুলো মিনার কানে যাওয়াতে উদ্বিগ্নভাব এসে বলল " কে মারা গেলো রে বিটু?"

আমি অবাক হয়ে দু'জনের মুখের দিকে তাকিয়ে বললাম "কে মারা যাবে? আমি তো কাউরির মারা যাওয়ার কথা বলিনি।"

বিটু "ও হাঁসদা গণ বলতে আমি ভাবলাম মারা গেছেন। তাহলে ম্যাডিসন ছেড়ে চলে গেলেন?"

মিলা আমার দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করল "হাঁসদা কে গো? আমি তো চিনি না।"

বললাম— "আমিও না। বিটু! এই হাঁসদা কোথা থেকে এলেন?"

" কেন আপনিই তো বললেন হাঁসদা গণ।"

"নাঃ। আমি বললাম হাওজদা গইন। হাউ ইজ দি গোয়িং। বাংলা করলে দাঁড়ায় কি হে কেমন চলছে?" । "আপনি এমন জড়িয়ে বললেন যে বুঝতে পারিনি।" চা ঢালতে ঢালতে একটু হেসে মিলা বলল— "তোমাকে আর বিটুকে ইংরাজী উচ্চারণ শেখাতে হবে না।"

"দেবী, এই শিশুকে সবদিক দিয়ে মানুষ করতে হবে যাতে ও নিজের কানে শুনতে পারে, নিজের হাতে রাঁধতে পারে। অতএব প্রশিক্ষণে বাধা দিও না।" বিটুকে বললাম— "শুধু উচ্চারণ নয়, সম্ভাষণটি কোথা থেকে আসছে তাও বুঝতে হবে।"

"মুখ দিয়েই তো কথা বলে এদেশের লোকে, নাকি সেটাও তফাৎ"

"না বৎস, যদি পরিচয় অল্প হয় তবে 'হাউইজদা গইনএ 'ই' এর উচ্চারণের আভাষ থাকবে শুধু। বন্ধুত্ব একটু বেশী হলে একটু টেনে বলবে হাজদা গইন,' 'গইন' শব্দটা হৃদয় থেকে আসছে। দোস্তী খুব গাঢ় হলে বলবে হ্যায়ই হাজদা গণ' এবং গানের সিটকিরির মতো আওয়াজটা আসবে একদম পেটের থেকে, উচ্চৈস্বরে। ফলে এক কথায়

বুঝবে বন্ধুত্বটা কতটা এগোলো। তবে এই সম্ভাষণটি মেয়েদের মুখ কদাচিৎ শুনতে পাবে। উনারা বলবেন 'হাউ আর য়্যু।"

চায়ে চুমুক দিয়ে মিলা বলল, "বাঃ দার্জিলিঙের চা-টা করেছ, খুব ভালো হয়েছে। আর ঠিক সময় মতো চা দেওয়ার জন্য থ্যাংকু"

বললাম "য়্যু ব্যাট"

উৎসাহিত হয়ে বিটু বলল "মিলাদি তুমি ক্রিকেট খেল নাকি? তবে তোমাকে বলিহারি বান্টুদা, চা এর জন্য ধন্যবাদ দিতেই ব্যাট করতে দিলে, আর আমরা খেটে মরি। তবে খেলাটা হবে কোথায়? আমরা তিনজনেই নয় নিশ্চয়, আর কেউ আসছে তাহলে?"

"ক্রিকেট এল কোথা থেকে?"

ঢোক গিলে বিটু বলল "কেন তুমি যে বললে 'ইউ ব্যাট।"

"না তো, আমি মিলার ধন্যবাদের প্রত্যুত্তর দিলাম এদেশী কায়দায় বললাম 'ইউ বেট'।"

মিলা "অনেক হয়েছে গুরু ঠাকুর, এবার একটু হেঁটে আসা যাক্। বিটু তুই তো এখনও লেক মেনডোটা দেখিস নি, চল ভালো লাগবে।"

"এ্যাঁ, এই ঠাণ্ডায় লেকের পারে গেলেই নির্ঘাৎ জ্বর হবে।" বললাম "চল হে, কুঁড়ে হয়ে থেকো না। তাছাড়া যা খেলে তাতে তোমার কোলেস্টরল লেভেল বিপদজ্জনক সীমায় পৌঁছে গেছে সম্ভবত।"

"আমি তো শুধু চা আর আধখানা মাফিন খেলাম" ('মাফিন' কেক এবং পাঁউরুটির মাঝামাঝি স্বাদের একটি খাদ্য)। "হিসেব খুবই সোজা চায়ে দুধ আছে, দুধে মাখন আছে, মাখনে কোলেস্টরল আছে। ফলে চায়ে কোলেস্টরল আছে। আর মাফিন তো কোলেস্টরলে বিজ বিজ করছে। রাধিকা যেমন জগৎ কৃষ্ণময় দেখতেন। তেমনি তোমার দিদি জগৎ কোলেস্টরলময় দেখেন, এমনকি জলেও—আমাকে বাধা দিয়ে মিলা বলল "এত তুকতুক করি বলে এখনও হেঁটে চলে বেড়াচ্ছ। না হলে এতদিনে বাইপাস অপারেশন করে লেটুস পাতা বরাদ্দ হয়ে যেত"। "আমার হৃদয়ের খবরদারী করার জন্যেই তো তোমাকে খুঁজে বের করা। হৃদয়ের ওপর তোমার সম্পূর্ণ অধিকার, তাই তো হৃদয়েশ্বরী"

"থামো অধ্যাপকদের ফাজলামী ভালো দেখায় না। বিটু বাইরের হাওয়া গায়ে লাগা, শরীর মন দুটোই তাজা হবে।"

একটু ইতস্তত করে বিটু বলল, "আমি কিন্তু টুপি মাথায় দেবো। বান্টুদা বলছিল এখন টুপি মাথায় দিলে কুকুর তাড়া করতে পারে। সেপ্টেম্বরেই আমার কিন্তু বেশ ঠাণ্ডা লাগছে।"

"হবেই তো, এখন তো যা ঠাণ্ডা, তা দেশের শীতের রাতের সমান। সামনের বছর

থেকে তোর সয়ে যাবে। তবে কে কাকে বলছে। তোর গুরুঠাকুর নিজেই অক্টোবর থেকে মে অবধি মাথায় টুপি পরে, তোকে কুকুর তাড়ার ভয় দেখায় কোন আক্কেলে?"

বললাম— "বৎস ভয়ের কিছু নেই, কলকাতার চিড়িয়াখানায় শীতের মরশুমে যেমন দেশ বিদেশ থেকে চিড়িয়া আসে, তেমনি এ শহরে 'ফল' সেমিষ্টারে (গরমের শেষে শীতের আগেই গাছের পাতা ঝরতে শুরু করে। তাই এই সময়কে 'ফল' অর্থাৎ পাতা 'পড়ে যাওয়া'র মরশুম বলে) দেশ বিদেশ থেকে অনেক নবাগত ও নবাগতারা আসেন। তাদের হাবভাব, পোশাক-আশাক অনেক কিছুই আলাদা। ফলে কুকুর আজকাল এসব দেখে অভ্যস্ত হয়ে গেছে।" মিলা "ভীষণ বাজে বক তুমি। বিটু এখানে রাস্তায় বেওয়ারিশ কুকুরই নেই। গলায় চেন দিয়ে কুকুর বের করতে হয়। যদি কেউ পুলিশকে নালিশ করে যে চেন ছাড়া মালিক কুকুরকে রাস্তায় বের করেছে তবে পুলিশ জরিমানা আদায় করবে মালিকের কাছ থেকে। তাছাড়া খামোকা কুকুর তাড়া করবে কেন?" বেশ খানিকক্ষণ হেঁটে গাড়ী নিয়ে গেলাম সাপ্তাহিক বাজার সারতে সেখান থেকে ফিরে সবার জন্য কফি করলাম। কফি খেয়ে বিটু বলল "বান্টুদা, ভালো কফি খাওয়ার জন্য ধন্যবাদ।"

বললাম "স্যুওর।"

শুনে বিটু কেমন গম্ভীর হয়ে গেল, এদিকে মিলা রান্না শুরু করল। আমি বিটুকে গল্পের বই, গানের ক্যাসেট, দূরদর্শনের চাবি-কাঠি (রিমোট কন্ট্রোল) সব দিয়ে গেলাম সাপ্তাহিক কাজ যেমন বাথরুম পরিস্কার, ঘর সাফ করা ইত্যাদি কাজ সারতে। কাজ সেরে চান করে এলাম বিটুর কাছে। বিটু দেখলাম কি রকম একটু গম্ভীর, রান্না সেরে, চান সেরে মিলা খাওয়ার সাজিয়ে খেতে ডাকল আমাদের। খেতে বসে পেঁপে শুক্তো বিটুর দিকে এগিয়ে দিতে বলল— "ধন্যবাদ" বললাম "স্যুওর।"

বিটু রেগে মেগে বলল "তখন থেকে গালাগালি দিচ্ছেন কেন? আমি কি করেছি। দুবেলা খাচ্ছি তাই—।" মিলা তাড়াতাড়ি বাধা দিয়ে বলল, "কি হোল রে তোর? ও তো তোকে গালাগালি দেয়নি।"

"কেন, ঐ যে সকাল থেকে শুওর বলে গালাগালি দিচ্ছে।" শুনে মিলা তো হেসেই উচ্ছল। আমি ব্যাপারটা আগেই কিছুটা আন্দাজ করেছিলাম। বিটু খোলাখুলি বলাতে বুঝলাম কারণটা কি, বললাম, "ভায়া তোমাকে গালাগালি দিইনি, তোমার দেওয়া ধন্যবাদের প্রত্যুত্তর দিয়েছি মাত্র।" "তার মানে! এই তো সকালে বললেন ধন্যবাদের প্রত্যুত্তর ইউ বেট। এখন কথা ঘোরাতে বলছেন অন্য কথা"। মিলা "নারে কথাটা শুওর নয়। সিওর। তুই শুনছিস্ শুওর।" আমাকেও ধমক লাগাল "আচ্ছা, তোমারই বা ওকে অত কায়দা করে উত্তর দেওয়া কেন?"

বিটুকে বললাম "শোনো বৎস। আসলে কথাটা হচ্ছে সিউর অর্থাৎ 'নিশ্চয়ই' অর্থাৎ তুমি ধন্যবাদটা গ্রহণ করলে। তবে চলতি কথার টানে দাঁড়িয়েছে "স্যুওর"। "কে

জানে বাবা, এদেশে আসার আগে তো শিখেছিলাম কেউ ধন্যবাদ দিলে প্রত্যুত্তর হচ্ছে ইউ আর ওয়েলকাম, এখন দেখেছি তারও রকমফের আছে। এমকি বাংলায় গালাগালিও দেওয়া যায়।"

"বৎস ধন্যবাদের প্রত্যুত্তর এর ব্যাপারে তোমার শিক্ষা এখনও অসম্পূর্ণ, একদম পোষাকী প্রত্যুত্তর 'ইউ আর ওয়েলকাম।' তার থেকে কম পোষাকী 'স্যাওর' এবং নো প্রবলেম। অনেকটা আমাদের ভাষায় 'এ আর এমন কি করলাম।' একদম চলতি হচ্ছে উঁ-হুঁ। উঁ তে টান থাকবে, তবে ছোট। হুঁ তে জোর থাকবে তবে টান দিয়ে ঝটতি শেষ করতে হবে। বাপুহে সাহেবী কেতা শেখা কি অতই সোজা? একটা ভাষা রপ্ত করতে গোটা জীবন কেটে যেতে পারে। তোমার ভাগ্য ভালো, তাই আমার মতো শিক্ষক পেয়েছ। নাও আর রাগ করে থেকো না। ক্যাট ফিস্ (মাগুর গোত্রীয় মাছ, তবে ওজনে এক দেড় কিলো) দিয়ে বেগুনের সুকুৎটা খাও। ওটা তোমার দিদি যত্ন করে রেঁধেছে। খেয়ে দ্যাখো"

খেয়ে দেয়ে উঠে সত্যজিৎ রায়ের গুপী গায়েন দেখবো বলাতে বিটু বলল "ও তো তোমার বাষট্টি বার দেখা।"

"ভুল হল, সাড়ে বাষট্টি বার। একবার কলকাতায় দেখতে দেখতে আলো নিভে গিয়েছিলো। গানগুলো আমার খুব ভালো লাগে, বিশেষ করে ঐ ওস্তাদের পালকী করে যেতে যেতে দেশী টোড়ী।"

বিটু "সিনেমা তো অনেক দেখেছি, এদেশের গল্প বলুন না।" মিলা "হ্যাঁ তোমার সেই সি. ডোনালড-এ প্রথম খাওয়া নিয়ে।" "তবে শোনো, ছাত্র হিসেবে তখন সবে এসেছি। বাসা ভাড়া করেছি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে একটু দূরে। আগের দিন দুপুরের খাওয়ার বাসা থেকেই নিয়ে এসেছিলাম। সেদিন ঘুম থেকে উঠতে দেরী হয়ে গিয়েছিলো, ফলে খাওয়ার নিয়ে আসা হয়নি। তাই দুপুরে খাওয়ার জন্য একটা দোকানের খোঁজ করছিলাম। একটা দোকানে কাঁচের জানলা দিয়ে দেখলাম কয়েকজন বসে খাচ্ছে। বুঝলাম এটা খাবারের দোকান। দোকানের ঢোকার দরজার খানিকটা ওপরে ছাদের কাছে লেখা সি. ডোনালড্ আর সামনে হলদে রঙের দুটো লম্বাটে ধনুক মতো। দুটো ইংরাজীর ইউ অক্ষর, উলটে লেখা। সাহস করে ঢুকে তো পড়লাম তৈরী করা খাওয়ার দাম এদেশে ভীষণ বেশী। প্রথম মাসের বৃত্তির টাকা তখনও পাইনি, দেশ থেকে আনা অল্প ডলারই সম্বল, ফলে একটু ভয় ভয় করছিল। ঝকঝকে পরিস্কার টেবিল। অনেকটা ছেলেমেয়ে কাউন্টার থেকে অর্ডার মতো খাওয়ার দিচ্ছে। কাউন্টারের পেছনে খাওয়ার নাম, দাম সব লেখা। খাওয়ার দাম সস্তা দেখে আশ্বস্ত হলাম, লাইন ধরে আসতে আসতে এগিয়ে চললাম, হঠাৎ দেখি আমি কাউন্টারের এপাশে, ওপাশে একটি ছেলে জিজ্ঞাসু চোখে আমার দিকে তাকিয়ে। বোর্ডে কতরকম খাওয়ার নাম লেখা, কোনওটাই পরিচিত নয়, হঠাৎ চোখে পড়ল 'ফিলেট-ও ফিশ' বুঝলাম মাছ দিয়ে তৈরী কোনও খাওয়ার। পাশের কাউন্টারে এক ভদ্রলোক কিসব

খাওয়ার অর্ডার করে শেষে বলল "অর্ডারা ফ্রাইস এ্যাণ্ডা কোক।" আমি চকিতে নিজের অর্ডার ঠিক করে ফেললাম। বললাম, "ফিলেট-ও-ফিশ, অর্ডারা ফ্রাইস এ্যান্ কোক।" দোকানী কিছু বুঝল বলে মনে হল না। তা আবার বাঙ্গালী উচ্চারণে ইংরাজী। দোকানী ভুরু কুঁচকে একটুক্ষণ আমার দিকে তাকিয়ে থাকল। তারপর পেছন ফিরে হাঁক দিল, "হে মাইক কামোভার হের" বুঝলাম মাইক অর্থাৎ মাইকেল নামের কাউকে ডাকছে। জহর রায় গোছের একজন বয়স্ক ভদ্রলোক এলেন, দেখে বুঝলাম কর্তা ব্যক্তি। ব্যাক প্যাক সহ আমাকে দেখে বুঝলেন, 'বিদেশী চিড়িয়া, নয়া আয়া'। আমাকে গোটা গোটা ইংরাজী উচ্চারণে প্রশ্ন করলেন আমি কি খেতে চাই। আমিও বিশুদ্ধ বাঙ্গালী উচ্চারণে আমি কি চাই বললাম— 'আই ওয়ান্ট এ ফিলেট-ও-ফিশ, পটাটো ফ্রাই এ্যাণ্ড এ কোকাকোলা।' অর্থাৎ আমি ফিলেটো ফিশ, আলু ভাজা আর কোকাকোলা চাই। ভদ্রলোক শুনেই বললেন "হে এ নায়াই গচা, ইউ ওয়ানা ফিলেএ, ফ্রেঞ্চ ফ্রাই এ্যাণ্ড কোক, রাইট।' ভাষা যে খুব একটা বুঝলাম তা নয় তবে দু'চারটে শব্দ পরিচিত ঠেকল, বুঝলাম এবার খাওয়া পাওয়া যাবে। ঘাড় নেড়ে সম্মতি জানালাম। ততক্ষণে অন্যান্য কাউন্টারের তরুণ ও তরুণী দোকানীরা এবং খরিদ্দারেরা আমার দিকে তাকাচ্ছে বুঝতে পারলাম। আমার পেছনে অপেক্ষারতা মহিলা উশখুস করছেন, আমি নিশ্চিন্ত এবং নির্বিকার ভাবে দাঁড়িয়ে থাকলাম। দোকানী খুটং খাটাং করে বোতাম টিপে বলল এক ডলার দশ সেন্ট। পয়সা দিতে দিতে হিসেব করে দেখলাম দেশের টাকায় প্রায় আট টাকা (বছর কুড়ি আগে এক ডলার ছিল সাত টাকার সমান)। অর্থাৎ অনাদীর দোকানে মোগলাই কষা মাংস, গাঙ্গুরামের গোটা দুই রসগোল্লা খাওয়ার পরও বিকেলে বাদাম ভাজা খাওয়ার পয়সা থাকত। যাক্ বিদেশের দোকানে নিজে অর্ডার করে খাওয়ার পাচ্ছি বলে আত্মবিশ্বাস বেড়ে গেল, মনে মনে টুক করে হাতমোড়া বিবেকানন্দের ছবিকে একটা প্রণাম করলাম, ভাবলাম বিপদ কেটে গেছে। ওমা আবার ধাক্কা। দোকানী বলল, 'হেররটুগো?" কথার সুরে বুঝলাম কিছু একটা প্রশ্ন করছে। উত্তর কি হবে জানিনা, ফলে চুপ করে থাকলাম, ভাবলাম আবার বোধহয় মাইককে ডাকবে। সমস্যার সমাধান দোকানী নিজেই করল। "ওল আল মেক্‌টু গো' বলে একটা বড় ঠোঙায় খাওয়ারগুলো ভরে হাতে দিল। আমি একটা খালি টেবিল দেখে বসে খাওয়ারগুলো বের করলাম। একটা মাছের স্যান্ডুইচ, আলুভাজা আর কোকাকোলা।'

গল্প শুনে মিলা তো যথারীতি হেসেই খুন, বিটু অল্প হাসতে হাসতে বলল— 'দোকানটার নাম তো ম্যাক ডোনালড্ তাই না?"

"হ্যাঁ তবে তখন বুঝিনি।"

"আপনাকে তিনটে প্রশ্ন করি। প্রথম ফিলেট-এ টি এর উচ্চারণ হয় না তা তো আপনি জানেন নিশ্চয়। তাই ফিলেট না বলে ফিলে বললেন না কেন? 'দুই গচা মান কি'। তিন হেররটুগো মানে কি"

"ফিলেট, ডিপোট এসবে 'টি' এর উচ্চারণ হয় না জানি। তবে এদেশে এসে ইস্তক উচ্চারণের এত হের ফের শুনেছিলাম যে ভাবলাম টি উচ্চারণ করাই ঠিক হবে। তোমার দ্বিতীয় প্রশ্ন 'গচা' নিয়ে। কথাটা হচ্ছে গট ইউ, অর্থাৎ তোমার কথা বুঝতে পেরেছি। তবে গট ইউ কি করে গচা হয় তা এখনও বুঝিনি। তৃতীয় প্রশ্ন হেররটুগো। কথাটা হচ্ছে হেয়ার অর টু গো। অর্থাৎ এখানে বসে খাবে না বাইরে নিয়ে যাবে। দোকানে বসে খেলে প্লাষ্টিকের ট্রের ওপর সাজিয়ে দেবে। আর বাইরে নিয়ে গেলে ঠোঙায় সাজিয়ে দেবে। এই ইংরাজী উচ্চারণ বড় গড়বড়ে বস্তু। এই বিশ্ববিদ্যালয়ে এক ভাষাতত্ত্ববিদ একবার একটি বক্তৃতায় বলেছিলেন যে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের লোক ইংরাজী বিভিন্ন ভাবে বলে। উনি যে কোনও বক্তার ইংরাজী শুনেই বলে দিতে পারতেন কে কোথাকার লোক। খোদ ইংলণ্ডের সাথে আমেরিকার ইংরাজী উচ্চারণ আলাদা, আমেরিকার বস্টন অঞ্চলের লোক টেক্সাসে গেলে চট করে সব কথা বুঝতে পারে না। ভারতেই দেখনা, উত্তর ভারত আর দক্ষিণ ভারতে ইংরাজীর উচ্চারণ আলাদা, ফলে যতই ইংজিরি শিখে আস না কেন, ধাক্কা তুমি খাবেই। তুমি যতই চেষ্টা কর না কেন, এদেশে জন্মে ইস্তক না থাকলে উচ্চারণ এদেশের মতো হবে না। এখানকার অধিবাসী ঠিকই বুঝবে তুমি কোথাকার বুলবুলি পাখি। তবে একটু ঘঁসে মেজে নিতে হয়। কাজ চালাবার জন্য এই আর কি। তবে বিদেশী ভাষা ইংরেজরাও রপ্ত করতে পারেনি। যেমন ধর বার্ডয়ান। জায়গাটার নাম বর্ধমান, আমরা ভাবি ওটা ইংরাজী উচ্চারণ। আসলে ওটা ভুল উচ্চারণ। যেমন 'বৈদিক' হল 'ভেদিক'। আর আমরা ইংরেজদের নকল করে ঐ কথাগুলো ভুল উচ্চারণ করে ভাবি শুদ্ধ ইংরাজী উচ্চারণ করছি।"

ইতিমধ্যে একটা ফোন আসাতে উঠে ফোন ধরতে গেলাম। ফিরে আসতেই বিটু বলল "আজ উঠি, কাল আবার লাইব্রেরীতে যেতে হবে।

বললাম বাঃ "এই তো চাই, স্নাতোকোত্তর ছাত্র, রবিবারে না পড়লে হবে কেন। তবে বিকেলের দিকে ফোন কোরো। কাল একটা চিলি প্রতিযোগিতা আছে। নিয়ে যাবো।"

মিলা "খবরদার যাস না ওখানে। একদম চোখের জলে নাকের জলে হয়ে ফিরবি।"

"কেন চিলি মানে তো লঙ্কা, কার গাছে কত বড় লঙ্কা হয় তার প্রতিযোগিতা। এই তো নাকি, তা লঙ্কায় হাত না দিলেই হল।"

"না না, চিলি হচ্ছে মাংসের কিমা, রাজমা, টমাটো দিয়ে একটা স্যুপ মতো। তবে প্রতিযোগিতায় যারা আসে তারা কে একজন এমন ঝাল দেয় না, খেতেই পারবি না। তুই পড়াশুনা নিয়েই থাক।"

সেদিনকার মতো বিটুকে গাড়ী করে বাসায় ছেড়ে এলাম। প্রায় মাসখানেক পরে আবার বিটুবাবুর আবির্ভাব, এসেই বলল—

"এক কাপ কড়া কফি খাওয়াবে, যা ঠাণ্ডা।" কফি খেয়ে ধাতস্ত হয়ে বিটু বলল "ওঃ এখানে যে কত দেশের ছাত্রছাত্রী আসে। ভাষা বোঝা দায়। সেদিন একটা ক্লাসঘর

খুঁজে পাচ্ছিলাম না। একটি ছেলেকে জিজ্ঞেস করতে কাঁধ ঝাঁকিয়ে বলল 'আয়ডুনা'। কথাটা যে ইংরাজী নয় সে সম্বন্ধে আমি নিশ্চিত। তবে দেখে তো মন হল আমেরিকান।"

"কিভাবে বুঝলে ছেলেটি আমেরিকান?"

"কেন শ্বেতাঙ্গ।"

"বৎস তাবৎ ইউরোপ এবং এশিয়ার পশ্চিমপ্রান্তের লোকেরাই শ্বেতাঙ্গ, তারা সবাই আমেরিকান নয়। আমেরিকান হচ্ছে একটা রাজনৈতিক পরিচিতি। কেউ শ্বেতাঙ্গ না হলেও সে আমেরিকান হতে পারে। যেমন এদেশের কৃষ্ণাঙ্গরা। অথবা ধরো এদেশে জন্মানো মিত্তির মশাই-এর ছেলে সন্তু। জন্মসূত্রে আমেরিকান। এ ভুল শুধু তুমি নয় এদেশে বসবাসকারী অধিকাংশ ভারতীয়কেই করতে দেখেছি। যাক্ তোমার ধাঁধায় আসা যাক্। তোমার প্রশ্নের উত্তরে ছেলেটি বলল 'আয়ডুনা', তাই তো?"

"হ্যাঁ আমি যথাসম্ভব পরিস্কার করেই প্রশ্ন করেছিলাম কিন্তু।"

একটু ভেবে বললাম "এতদিন জানতাম সন্ধি শুধু সংস্কৃত এবং সংস্কৃত থেকে উদ্ভূত ভারতীয় ভাষাতেই আছে। এখন দেখছি তা ক্রমশঃ বিস্তার লাভ করছে। ছেলেটি তোমাকে বলেছিল আই ডোন্ট নো অর্থাৎ আমি জানি না। দেখে, আয়ডুনা আর আমি জানি না কত কাছাকাছি। সাধে কি আর ইংরাজীকে ইণ্ডো-ইউরোপীয়ান ল্যাঙ্গুয়েজের মধ্যে ফেলেছে।"

"এতো বোঝা গেল। এর পরের ধাঁধার জবাব দিন তো দেখি। কদবেল গনীন হার।'

মিলা— "সে আবার কি ভাষারে। নির্ঘাৎ পেরু বা বলিভিয়া অঞ্চলের কেউ।"

বললাম— "ঘটনাটা কি আগে বল, ওটা ইংজিরি হলেও হতে পারে।"

মিলা বাধা দিয়ে বলল— "দাঁড়াও এ ধাঁধা পরে হবে, তার আগে তোমার সেই সানসা আপ গল্পটা শোনাও না।"

বললাম— "দাঁড়াও শুকনো গলায় গল্প হয় না। একটু চা করি, তোমরা দুজনেই খাবে আশা করি।"

বিটু— "বাঃ বেশ জমেছে। বাইরে হাড় কাঁপানো ঠাণ্ডা, অথচ ঘরের ভেতরটা গরম, তার সাথে গরম চা আর আড্ডা।"

মিলা— "ভাইরে এখনই হাড়-কাঁপানো ঠাণ্ডা বলিস না, এরপর যখন ফারেনহাইট আর সেন্টিগ্রেডে বন্ধুত্ব হবে তখন কি করবি? (তাপমাত্রা বিযুক্ত চল্লিশে ফারেনহাইট আর সেন্টিগ্রেড এক হয়ে যায়)।"

বিটু— "এ্যাঁ বিযুক্ত চল্লিশ, অত ঠাণ্ডা পড়ে নাকি?"। "আমি চা এর জল চাপাতে চাপাতে বললাম "উঁহু তোমার দিদি ভুল বলছে, হার্ডওয়ার দাপট সহ ওটা বিযুক্ত ষাট হয়, ফারেনহাইটে। তবে শীতে সাধারণতঃ তাপমাত্রা দিনে যুক্ত পনেরো এবং রাত্রে শূন্য।

অবশ্যই ফারেনহাইটে। চিন্তা নেই এরকম গোটা দুই শীত কাটাও তখন বিযুক্ত গা সওয়া হয়ে যাবে যুক্ত আশি (সেন্টিগ্রেডে ২৭ ডিগ্রী) হলেই গা চিড়বিড় করবে।" চায়ে একটা ছোট চুমুক দিয়ে বললাম, "মিলা তোমার কথায় সানসাআপএর ঘটনাটা বলছি তবে দ্বিপ্রাহরিক আহারটা যেন যুতসই হয়। অবশ্য বেশী কিছু নয়। গরম সিঙ্গারা আর মুড়ি মাখা হলেই হবে। সিঙ্গারার ময়দা নয়ত আমিই মেখে দেবো। তাতে আমার আপত্তি নেই। বকবক করলে শক্তিক্ষয় হয় তার ওপর এসব ধাঁধার উত্তর, সব মিলে ওজন না কমে যায়।"

মিলাকে প্রতিবাদ করার সুযোগ না দিয়েই শুরু করলাম "তখন ঘন্টা ষোল হল এদেশে এসেছি। নিউইয়র্কে এক বন্ধুর বাড়ীতে উঠেছিলাম সে একাই থাকত একটা ঘর ভাড়া করে ওখানে দিন দুই থেকে আমার পড়াশুনার জায়গায় যাওয়ার কথা, হাতে কুড়ি ডলার, আর একটা তিনশো ডলারের চেক, খুব হিসেব করে চলতে হবে। বন্ধুটি রাতেই বলল যে সে খুব ভোরে উঠে ক্লাসে চলে যাবে। আমি যেন সামনের দোকানে গিয়ে ভালো করে প্রাতরাশ সারি। দুপুরে দুধমুড়ি কলা খেলেই হয়ে যাবে কারণ এক ডলারে সকালে অনেকটাই খাওয়ার পাওয়া যাবে। দুপুরে বাইরে খেতে খরচ বেশী। আমি তখন কোনও রকমে ইন্সট্যান্ট কফি করতে পারি। বলল সকাল নটার মধ্যে দোকানে যেতে। সকাল ৯টা নাগাদ ঘুম ভাঙতেই হাত মুখ ধুয়ে গেলাম সামনের দোকানে। দোকান তখন ফাঁকা, মাত্র একটা টেবিলে একজন খাচ্ছে। অন্য একটা টেবিলে বসলাম, দেখলাম টেবিলে একটা কার্ডে বড় বড় করে লেখা আছে আজকের আকর্ষণ (স্পেশাল টুডে), দুই গুণিতক দুই গুণিতক দুই, তলায় ছোট করে লেখা, দুটো ডিম, দুটো টোস্ট, দুটো প্যানকেক, দাম মাত্র এক ডলার। বুঝলাম বন্ধু ঠিকই বলেছে। সস্তায় অনেক খাওয়ার সকালে। ডিম আর টোস্ট তো খাওয়া যাবে, তবে দু টুকরো কেক অত সকালে তাও চা কফি ছাড়া কিভাবে খাবো তাই ভাবছি। কলকাতায় বড়ুয়ার কেক খেয়েছি। বড় সাইজেরই হয়। এখানে অবশ্য প্যান কোম্পানীর কেক। খাদ্যতালিকায় কফির দাম দেখলাম চল্লিশ সেন্ট অর্থাৎ প্রায় তিন টাকা। তাই ঠিক করলাম কফি খাবো না। জল দিয়েই কেক গলাধঃকরণ করবো, বাড়ীতে গিয়ে কফি খাবো। কিছুক্ষণ পরেই একটি মহিলা এসে জিজ্ঞেস করলেন "ডুলাক কঅফি?" ঘাড় নেড়ে বললাম "নো কফি, ওয়াটার প্লিজ।"

এক গ্লাস জল নিয়ে আসতেই মহিলার হাতে বিশেষ আকর্ষণ মার্কা কার্ডটা তুলে দিলাম, যাতে বেশী কথা বলতে না হয়। একটু হেসে মহিলা বললেন "উলাক স্পেশাল, দ্যাটস গুউড। হায়ই লাক ইর এগ? অর্থাৎ তুমি 'স্পেশাল' বেছেছ, খুব ভালো, তোমার ডিম কেমন লাগে বললাম "আই লাইক এগ ভেরী মাচ্" না-না। আবার ভুবনমোহিনী হাসি হেসে মহিলা বললেন" নোনা, আমিন উলাক ওভারিজি অর স্ক্র্যামবলড়? ভাবলাম এত প্রশ্ন কিসের, দেশে তো এত ঝামেলা নেই। ডিম বলতে মামলেট। কথাটা যে ওমলেট

সেটা অবশ্য পরে জেনেছি। সেদ্ধ খেতে হলে বলে দিতে হবে সেদ্ধ ডিম চাই। তারপর ভাবলাম ডিম নিয়ে এত সকালে স্ক্রিবল খেলতে বসবো। এখনও ভালো করে ঘুম কাটেনি, তারপর চা কফিও খাইনি, মাথা খাটাবো কি করে। অন্যটা আন্দাজ করলাম একটা কিছু ইজি অর্থাৎ সহজ কিছু। ডিম সেদ্ধই সবচেয়ে সোজা, আমার অবশ্য মামলেটই ভালো লাগে। তবে এখন সোজা কিছু খাওয়াই ভালো। সেদ্ধই বলি। তখন কি জানতাম যে ইজি খেতে গিয়ে আরও ঝামেলায় পড়ব। যাক্ বললাম "ইজি ইজি"

আবার প্রশ্ন। ওঃ কি ঝামেলায় যে পড়লাম, নিজের পয়সায় খাবো,তাতেই এত প্রশ্ন। তাহলে যখন পয়সা দেবে অর্থাৎ নকরির জন্য সাক্ষাৎকার হবে তখন কত প্রশ্ন করবে কে জানে। তখন কি জানতাম এদেশে সবই উল্টো। দোকানে খেতে গিয়ে দশ বিশটা কঠিন প্রশ্ন করে আর চাকরি দিতে কঠিন প্রশ্ন করে দু-চারটে। যাই হোক এ যাত্রায় উদ্ধার তো পেতে হবে। পরিচারিকা মৃদু হেসে প্রশ্ন করল— "সানসা অপর সানসা ডাইন?" প্রশ্নটাই বুঝলাম না, শুধু বুঝলাম আপ, অন্যটা নিশ্চয়ই ডাউন, ওপরে ওঠা থাকলেই নীচে নামাও থাকবে। দশ হাজার মাইল দূরে এসেছি ওপরে ওঠার জন্য, ডাউনে যাবো না। বললাম "আপ আপ"। পরিবেশিকা আর প্রশ্ন না করে চলে গেলেন দেখে আস্বস্ত হলাম। এতক্ষণে দোকানের ভেতরের চারদিকে তাকিয়ে দেখার সুযোগ পেলাম। সারদা দেবীর বাণী মনে পড়ল' 'যখন কোথাও যাবে, আশেপাশে নজর করবে' তাই সব কিছু ভালো করে নজর করার চেষ্টা করলাম একটা বাদে সব টেবিলই ফাঁকা। একটা টেবিল বাদ দিয়ে পরের টেবিলে দেখলাম একজন বসে কফি খেতে খেতে খবরের কাগজ পড়ছে। একটু পরে ঐ পরিচারিকাটি ঐ টেবিলে খাওয়ার দিয়ে গেলেন। ভদ্রলোকও 'বিশেষ আকর্ষণ' বেছেছেন। খাওয়ার দিতে ভদ্রলোক দেখলাম দিব্যি হাত দিয়ে ধরে টোষ্ট খাচ্ছেন। দেখে একটু আশ্বস্ত হলাম। এদেশে আসার আগে কাঁটা চামচ ছুরি নিয়ে বেশ ধস্তাধস্তি গেছে। তখন এক ডাকসাইটে বিলেত ফেরৎ মেশোর কাছে দিন দুই কাঁটা চামচ দিয়ে খাওয়ার শিক্ষা নিতে হয়েছিল। শুনেছি উনি বিস্কুটও কাঁটা চামচ দিয়ে খান। হাত দিয়ে টোষ্ট খেতে দেখে ধড়ে প্রাণ এলো। আমার তো দেশে থাকতে ধারণা হয়েছিল যে রেষ্টুরেন্টে খাওয়ার হাত দিয়ে ছুঁলেই নেটিভ আদমী বলে গলা ধাক্কা দিয়ে বের করে দেবে। যাই হোক কিছুক্ষণ পরে আমার খাওয়ার দিয়ে গেল। দুটো টোস্ট অর্থাৎ চার টুকরো পাঁউরুটি, দুটো ডিমের পোচ্, আমরা যেরকম খাই আর কি, আর দুটো উত্তাপামের (মাদ্রাজী খাওয়ার) মতো দেখতে কিছু খাওয়ার। একটা বোতলও দিয়ে গেল, লেখা আছে ম্যাপল সিরাপ। খাওয়ার দিয়ে মহিলা বলে গেলেন "এনজয়" অর্থাৎ উপভোগ করে খাও। মনে মনে বললাম 'তা আর বলতে।' ডিম আর টোষ্ট তো বুঝলাম কিন্তু ঐ উত্তাপাম আর সিরাপ ভরা বোতল নিয়ে একটু ঝামেলায় পড়লাম, দূরের টেবিলে তাকিয়ে দেখলাম ভদ্রলোক বোতলের সিরাপ উত্তাপামের ওপর ঢেলে ডান হাতে কাঁটা ধরে, কাঁটা দিয়েই কেটে কেটে খাচ্ছেন।

দেখেই বুঝলাম ভদ্রলোক আমার মেশোর পাল্লায় পড়েন নি। তবে পরে জেনেছি এটা আমেরিকান কেতা। মেশোর সাথে খেতে বসে একদিন বাঁহাত দিয়ে কাঁটা ধরে আলুর টুকরো মুখে দিতে না পেরে ডানহাত দিয়ে বেশ বাগিয়ে কাঁটা ধরে খেতে গিয়ে ধমকের চোটে বিষম খেয়েছিলাম। বৃটিশরা কখনও ডান হাতে কাঁটা ধরে না, কাঁটা দিয়ে কোনও খাওয়ার কেটে খাওয়া তো বোধহয় মহাপাপ বলে গণ্য হবে। এদিকে আমেরিকানরা নেহাৎ প্রয়োজন না হলে খাওয়ার সময় ছুরি ব্যবহার করে না। কাটাকুটি সবই কাঁটা দিয়ে, তাও ডান হাতে। যাক্ ভদ্রলোককে দেখে বুকে বল পেলাম। চিন্তা হল সিরাপ নিয়ে, ভাবলাম ঠাণ্ডার দেশ, সর্দ্দি কাশি লেগেই থাকে তাই বোধ হয় স্বাস্থ্য বিভাগের নির্দেশ আছে খরিদ্দারদের খাওয়ার সাথে সিরাপ দেওয়ার। বোতলের গায়ে লেখা আন্ট জেমিনা, অর্থাৎ জেমিনামাসীর তৈরী সিরাপ। দুলালের তালমিছরীর মতো আর কি। সর্দি কাশির জন্য টোটকা গোছের কিছু। উত্তাপাম একটু ছিঁড়ে মুখে দিয়ে দেখলাম। বেশ মিষ্টি, পরে জেনেছি যে ওটাই প্যান কেক অর্থাৎ চাটুতে ভাজা কেক তাই প্যান কেক। প্যান কোম্পানীর কেক নয়, অনেকটা আমাদের ময়দার গোলা দিয়ে তৈরী সরুচাকুলীর মতো। সরুচাকুলী নোনতা এটা মিষ্টি আর একটু মোটা। সিরাপ ও চেখে দেখলাম মিষ্টি। শেষমেষ ঠিক করলাম সিরাপসহ প্যানকেক খাওয়াই ভালো। ওষুধ হলেও খেতে তো মিষ্টিই। অন্তত সর্দিকাশির প্রতিষেধক হিসেবে কাজ করবে। পরে বন্ধু বলল ওঠা মেপল গাছের রস থেকে তৈরী। অনেকটা আমাদের খেজুর রসের মতো।"

আমি থামতে বিটু বলল "দাদা আপনার তো অনেক অভিজ্ঞতা দেখেছি তবে সানসা আপ আর ডাউন কি বললেন না তো।" "সানি সাইড আপ অর্থাৎ পোচে কুসুমটা ওপরে থাকবে। আর সানি সাইড ডাউন। অর্থাৎ পোচটা ডিমের কুসুমসহ উল্টে ভেজে দেবে। তাতে কুসুমটা নরম থাকবে। একটু ভাজাও হয়ে যায়। আরও আছে, সব বললে মহাভারত হয়ে যাবে। বক্ বক্ অনেক হল এবার চল সিঙ্গারার ময়দা ঠেসতে হবে।" কলকাতায় কোথাকার সিঙ্গারা সবচেয়ে ভালো ইত্যাদি গল্প চলল কিছুক্ষণ। সিঙ্গারা ভাজতে ভাজতে মিলা বলল— "ধাঁধার উত্তর কিছু পেলে।"

"না, আরও কিছু তথ্যের প্রয়োজন।" মিলা বিটু তোর ড্যাশদাকে ঘটনাটা সবিস্তারে বল, আমি কিছুটা আন্দাজ করেছি, তবে সেটা ক্রমশ প্রকাশ্য।"

বিটু— "ড্যাশদা আবার কি কথা? ভালো নামে না ডাক, অন্য কিছু বল। ড্যাশদা কি?"

মিলা— "বঙ্গললনা স্বামীর নাম মুখে আনেনা জানিস তো। অবশ্য এমনিতেই ডাক নামটা আমার পছন্দ নয়, তাই নামের জায়গায় ড্যাশ দেওয়া এই আরকি।"

"দেখলে তো ভায়া এরে কয় কলিকাল, তবে মিনসের থেকে ড্যাসের ঠেস ভালো, যাক্ ওসব বাদ দাও, ধাঁধায় এস।" বিটু গল্প শুরু করল "সেদিন রসায়ন বিদ্যার হাতে

কলমে কাজ শেখার দিন। অধ্যাপক আমাদের সবার কাজ বুঝিয়ে একটু বাইরে গেছেন। ছাত্ররা দেখলাম ফুটবলের খুব ভক্ত তিনচার জন মামী ডলফিন, সেনসোটি ভ্যাঙ্গল আরও কি কি সব দলের নাম নিয়ে খুব তর্কাতর্কি শুরু করেছে বেশ উচ্চগ্রামে কথাবার্তা চলছে। এমন সময় অধ্যাপক উত্তেজিত হয়ে ঘরে ঢুকেই বললেন 'কদবেল গনীন হার,' সবাই সাথে সাথে শান্ত হয়ে গিয়ে যে যার নিজের কাজে লাগল।"

খুব মনোযোগ দিয়ে গল্পটা শুনে বললাম "প্রথম কথা এদেশের ফুটবল কিন্তু আমাদের ফুটবল নয়। ওটা ইংরেজরা যে রাগবি খেলে তার মতো। যে বল নিয়ে খেলা হয় তা এক ফুট লম্বা আকারে অনেকটা আমাদের পুলির মতো। তার থেকে নাম ফুটবল। আর মামী ডলফিন নয়। ফ্লোরিডা রাজ্যের মায়ামী শহরের ফুটবল দলের নাম মায়ামী ডলফিন। আর কথাটা ভ্যাঙ্গল নয় বেঙ্গল, খুব সম্ভবতঃ রয়েল বেঙ্গল টাইগার থেকে এসেছে। এখানে অনেক শহরেই ফুটবল, বাস্কেটবল এসবের দল আছে। ব্যবসা প্রতিষ্ঠানই বলতে পার। রাগবির মতো হলেও এদেশের ফুটবলে কোস্তাকুস্তি খুব বেশী। তাই আমি নাম দিয়েছি বলকুস্তি। থাক্ তোমার ধাঁধায় ফিরি। আমার প্রথম প্রশ্ন ভদ্রলোক কি জার্মান?"

"ঠিক জানিনা, তবে পদবী জনসন।"

"অর্থাৎ সম্ভবতঃ বাবার বংশ ইংরাজ। মা জার্মান বংশোদ্ভূতা হতে পারেন। খুব চিন্তায় ফেললে হে। কদবেল তো অধুনা পূব আর পশ্চিমবাংলার ফল, এদেশে গুজবেরী কিছুটা কদবেলের মত। তবে সেতো তো বেরী, বেল তো নয়।" মিলা বলল "আসল প্রশ্নটাই করলে না, ভদ্রলোক লম্বা কত। ওজন কি রকম। মোটাসোটা নিশ্চয় এবং মনে হয় গলগণ্ড আছে অর্থাৎ গলার কাছে দু' থাক চর্বি আছে, মুখটা কাতলামাছের মতো।"

বিটু উৎসাহিত হয়ে বলল— "ঠিক বলেছ মিলাদি, তুমি ধরলে কি করে?"

বললাম— "উনি সম্প্রতি শরদিন্দু অমনিবাস শেষ করেছেন। কিরীটি মাথায় গিজগিজ করছে।"

বিটু বলল— "সে তো বুঝলাম, কিন্তু কদবেলের সমাস্যার সমাধান কোথায় হল?"

মিলা হেসে বলল— "কথাটা হচ্ছে হোয়ার্ট দ্য হেল গোয়িং অন হেয়ার অর্থাৎ এখানে কি হচ্ছে কি। 'হোয়াট' হয়েছে 'খোয়াদ' আর 'দ্য হেল' কে তোর কানে মনে হয়েছে বেল, ফলে তুই শুনেছিস কদবেল, গোইং অন হয়েছে গইনন তুই শুনেছিস গনীন। আর হেয়ার হামেশাই হেয়র হচ্ছে। তুই শুনেছিস হার ফলে সব মিলে তোর কানে এসেছে কদবেল গনীন হার।" বিজয়িনীর হাসি হেসে মিলা আমার আর বিটুর দিকে তাকালো।

বললাম— "এবার বুঝেছে তো বাইরে বেড়াতে গেলে কেন সঙ্গে নিই। উনি দোভাষীর কাজ করেন।"

মিলা— "যতই প্রশংসা কর, সিঙ্গারা কিন্তু দুটোর বেশী নয়। রাতে আবার মাছের কালিয়া আর ছানার পোলাও আছে।"

বিটু— "ছানার পোলাও! এখানে কিনতে পাও নাকি, ভালো মিষ্টির দোকান আছে তাহলে।"

মিলা— "সিঙ্গারা যে দোকানে তৈরী হল দেখলি সে দোকানেই ছানার পোলাও-ও তৈরী হয়।"

বিটু— "অর্থাৎ তুমিই করবে। মিলাদি জিন্দাবাদ।" রাতে খেতে বসে সবে উচ্ছে আলুর চচ্চড়ি দিয়ে ভাত মেখেছি এমন সময় বিটু প্রশ্ন করল— "মিলাদি বীফ্ অর্থাৎ গোমাংস কি মুরগীর ঝোলের মতো রান্না করা যেতে পারে?" "হঠাৎ এ প্রশ্ন, তোর কি বীফ্ খাওয়ার সখ হয়েছে। ভুটকিদি যে বলল তুই মাংস খেতে ভালো বাসিস না, তোর জন্যই মাছ করলাম।"

"না আমার জন্য নয়, ক্লাসে লাগবে"

অবাক হয়ে বললাম "তুমি কি রান্নার ক্লাস করছো।" "না না তা নয়। দু সপ্তাহ পরে আমাকে একটা সেমিনার দিতে হবে। অবশ্য বীফ্ না করে মুরগীর কিছু করলেও হবে মনে হয়। দেখি অন্য সহপাঠীদের জিজ্ঞেস করে দেখবো।"

মিলা "তুই অবাক করলি বিটু। সেমিনারে কি মাংস ঘুষ দিয়ে পার পাওয়ার চেষ্টা করছিস্?"

বিটু— " কে জানে, আগের সেমিনারে অধ্যাপক তো বীফের কথাই জিজ্ঞেস করল।"

বললাম— "বিটুবাবু ঘটনাটা রহস্যজনক মনে হচ্ছে, ঠিক কি হয়েছিল বল তো।" মিনাকে বললাম— "এই যে কিরীটানি, রহস্য উদঘাটন কর তো দেখি।"

বিটু "প্রত্যেক সপ্তাহের শুক্রবার দুটো থেকে তিনটে অবধি একটা সেমিনার হয়। স্নাতকোত্তর ছাত্রছাত্রীরাই সেমিনার দেয়। যে যার নিজের পছন্দমতো বিষয় বেছে নেয়। এ সপ্তাহে জ্যাকি বলে একটি ছাত্রী ক্রিষ্টালো গ্রাফির ওপর একটা সেমিনার দিলো। সেমিনারের পরেই আমার একটা ক্লাস ছিলো। ফলে তাড়াতাড়ি বেরিয়ে আসছিলাম। দরজা দিয়ে বেরোতে বেরোতে শুনলাম অধ্যাপক প্রশ্ন করলেন— "ব্যাট জ্যাকি হোরস দ্য বীফ্? মানে জ্যাকি সব তো হল কিন্তু বীফ্ কোথায়।" জ্যাকি কোনও খাওয়ার দাওয়ার আনেনি, অধ্যাপক হয়ত বীফ্ দিয়ে কিছু খাওয়ার খেতে চেয়েছিলো, সবাই বোধহয় আনে। তাই..."

মিলা হো হো করে হেসে উঠে বলল "থাক আর বলতে হবে না।" আমার দিকে তাকিয়ে বলল "কিছু বুঝলে?"

"বিলক্ষণ।"

মিলা হাসতে হাসতে বিটুকে বলল "তুই কি নিয়ে বলবি ঠিক করেছিস?"

"ভাবছি হলোগ্রাম নিয়ে বলবো, তবে তোমরা যতই হাস, একটা কিছু নিয়ে যেতেই হবে, এমন কিছু বল যা আমি নিজেই করতে পারি।"

"তোকে কিছুই নিতে হবে না, লাইব্রেরীতে গিয়ে পড়াশুনা করে সেমিনারটা ভালো করে দে। ওতেই বীফের কাজ হবে।"

"হ্যাঁ, তোমার কথা শুনে গাড্ডায় পড়ি আর কি, ঠিক আছে আমি একটা কেক কিনে নিয়ে যাবো।"

"হেয়রস দ্য বীফ এর গল্প জানিস'

"এ্যাঁ এর পেছনেও গল্প?"

"ম্যাক ডোনালড্ এর খাওয়ার দোকান তুই তো দেখেছিস। ঐ ধরনের খাওয়ার পাওয়া যায় এরকম আর একটা দোকানের নাম বারগার কিং, দুটোরই সারা দেশে অনেক শাখা আছে। এবং দু' জনের মধ্যেই প্রতিযোগিতা আছে। একবার দূরদর্শনে বারগার কিং একটা বিজ্ঞাপন দিয়েছিলো হ্যামবারগার নিয়ে। হ্যামবারগার জানিস তো, বীফের টিকিয়া দিয়ে স্যান্ডুইচ। বিজ্ঞাপনে দেখাচ্ছে যে এক ভদ্রমহিলা ম্যাকডোনলড্-এ খেতে গিয়ে হ্যামবারগার চাইলেন। হামবারগার দিতেই ভদ্রমহিলা চেঁচিয়ে বললেন 'হোয়ারস দ্য বীফ্,' অর্থাৎ বারগার কিং এর বক্তব্য হচ্ছে ম্যাকডোনাল্ড-এর হ্যামবারগারে বীফ প্রায় নেই, ওদের হ্যামবারগারে বীফ্ অনেক বেশী। এরপর থেকে 'হোয়ারস দ্য বীফ্' এই বাক্যটা 'সারবস্তু কোথায়' এই অর্থে ব্যবহার হতে শুরু করে। অর্থাৎ তোর অধ্যাপক জ্যাকির সেমিনারে সারবস্তুর অভাব দেখে বলেছেন 'হোয়ারস দ্য বীফ্' ফলে তোকে অধ্যাপককে সন্তুষ্ট করার জন্য খাওয়ার নিয়ে যেতে হবে না। রান্না করে সময় নষ্ট না করে লাইব্রেরীতে গিয়ে পড়াশুনা কর। তাহলে আর হোয়ারস দ্য বীফ্ শুনতে হবে না।"

গল্প শুনে বিটু একটু আশ্বস্ত হল।

খাওয়া-দাওয়া শেষ করে ও দেশের প্রথামত বাড়ীর কর্তা অর্থাৎ আমি বাসন মাজতে শুরু করলাম। অবশ্য অনেক সময়ই প্রথার ব্যতিক্রমও দেখা যায়। আমাদের রান্নার বাসন অধিকাংশই বাসন ধোয়ার যন্ত্রে দিয়ে ধোয়া হয় না, ফলে হস্ত দ্বারা মর্জনই ভরসা। বাসন মেজে এসে বসতেই মিলা গুনগুন করে উঠল "এ গানে প্রজাপতির পাখায় পাখায় রঙ ধরায়।"

বললাম " কি ব্যাপার হৃদয়ঘটিত কিছু মনে হচ্ছে, কিস্‌সা কেয়্যা হায়?"

মিলা— "বিটু, হাউ ওয়াজ ইউর উইক এণ্ড এর চক্করে পড়েছে"

"এ্যাঁ দিল জখমী, তবে বৎস সাবধান।"

মিলা— "ওকে বিস্তারিত বলো। না হলে বুঝবে না।'

নুনলেবু দেওয়া একটু ভাজা জোয়ান মুখে দিয়ে শুরু করলাম "তখনও আমি ছাত্র। দ্বিতীয় সেমিষ্টারের মাঝামাঝি সময়। শীত প্রায় শেষ। বসন্ত আসছে। তবে তোমার মিলাদির সাথে মালা বদল তো দূরস্থান, উনার সন্ধানও জানা ছিল না। উনি তখন গোকুলে বাড়ছেন। আমি তখন যাতে বলে বিবাহযোগ্য অবিবাহিত যুবক। ফলে স্বভাতই প্রেমে পড়ার পূর্ণ অধিকার ছিল আমার। গোটা শীতে সপ্তাহের সাতদিনই ঘরে বসে জলখাওয়ার খেয়েছি। তাও একা, ওটা দ্বিতীয় সেমিষ্টার। ফলে হাতে অল্প কিছু উদ্বৃত্ত পয়সা আছে, মাসে এক আধবার দোকানে অল্পস্বল্প খাওয়ার মতো স্বচ্ছলতা এসেছে ততদিনে, অনেকের কাছে শুনেছি সকালে ডোনাট আর কফি উপাদেয়ে খাদ্য। আমার বাড়ীর সামনেই একটা ডোনাটের দোকান ছিল। বিট্টু তুমি ডোনাট খাওনি এখনও বোধহয়! ময়দার তৈরী, গোলমতো, কিছুটা কেকের মতো খেতে, মিষ্টি মিষ্টি। তবে তেলে ভাজা। একটি ডোনাট খেলে পেটে অনেকক্ষণ থাকে। আমার বয়সে অবশ্য একটা ডোনাট খেলে দুপুরের খাওয়ার ইচ্ছে আর থাকবে না, যাইহোক এক সোমবার সকালে বাড়ীতে খাওয়ার ছিল না বলে সামনের দোকানে গিয়ে হাজির হলাম, দোকানের সুবেশা সুন্দরী তরুণী প্রশ্ন করলেন— "কি চাই ; হেসে বললাম ডোনাট আর কফি।" দশ বারো রকমের ডোনাট হয়, আমার প্লেন বা কোনও কিছু না দেওয়া ডোনাটই ভালো লাগে। কফি সহ ডোনাট তো খেলাম, তবে ঐ মধুরহাসিনীর মুখ এবং হাসি সারা সপ্তাহ মনে রয়ে গেল পরের সোমবার আবার ডোনাট কফি খাওয়ার ইচ্ছে হল। তবে মনের গভীরে ঐ সুদর্শনার দর্শন পাওয়ার ইচ্ছেও ছিল, গিয়ে দেখি ভাগ্য সুপ্রসন্ন, কাউণ্টারে সেই মধুরহাসিনী। চোখে চোখ রেখে অল্প মিষ্টি হেসে যে প্রশ্ন করল তাতে আমি একটু ঘনিষ্ঠতার আভাস পেলাম। বুঝলাম আমাকে চিনতে পেরেছো। মনে একটা আনন্দের শিহরণ খেলে গেল। 'হাউ ওয়াজ ইওর উইক এণ্ড' অর্থাৎ শনি রবি তোমার কেমন কাটল? উৎসাহিত হয়ে বললাম 'ভালো', তারপর কেজো প্রশ্ন— কি খাবে ইত্যাদি। কফি ডোনাট নিয়ে টেবিলে বসে ভাবলাম 'ভালো' বলা বোধহয় ঠিক হয়নি, দুঃখ দুঃখ মুখ করে বোধহয় বলা উচিৎ ছিল 'ভালো না' অর্থাৎ 'তোমাকে ছাড়া কিভাবে ভালো কাটিবে' ভাবটা এই আর কি। যা হোক কফি খেয়ে বেরোবার সময় দূর থেকে একবার হাত নাড়লাম, কাউন্টারে দু' তিনজন খরিদ্দার ছিল, ফলে আমার হাত নাড়ার প্রত্যুত্তর পেলাম না, ঐ দিনের পর থেকে মধুরবাসিনী হলেন স্বপনচারিনী, ইতিমধ্যে গোটা সপ্তাহে মহিলাকে রাস্তা ঘাটে কোথাও একবারও দেখতে পেলাম না, ঐ দোকানেও যে দু' একবার উঁকি মারিনি তা নয়। পরে সোমবার আবার হাজিরা, সেই একই মধুর সম্ভাষন, একই হাসি, একই প্রশ্ন। কফি ডোনাট নিয়ে কাউন্টারের পাশে একটু সরে দাঁড়ালাম, পরে খরিদ্দার চলে গেলে একটু কথা বলব বলে। সেই হুকোমুখো খরিদ্দারকেও সেই মধুর হাসি দিয়ে অভ্যর্থনা করে সেই একই প্রশ্ন 'হাউ ওয়াজ ইউর উইক এণ্ড'। মুহূর্তের মধ্যে আমি একসাথে আহত এবং বিদ্রোহী হয়ে উঠলাম। মনে হল রবীন্দ্রনাথের

মেহের আলি চিৎকার করে বলছে 'ত ফাৎ যাও, সব ঝুট হ্যায়।" আস্তে আস্তে টেবিলে এসে বসলাম, কফি আর ডোনাট মনে হল বিষ, কিন্তু কি করি গরীব ছাত্র, ষাট সেন্টের খাওয়ার ফেলি কি করে । বিষণ্ণ বদনে খাওয়ার গলাধঃকরণ করে বেরিয়ে এলাম, পরের সোমবার কিছুটা অভ্যেসের বসে কিছুটা আশা নিয়ে ডোনাটের দোকানে গেলাম। বিরাট ছন্দপতন। আমারই এক সহপাঠী কাউন্টারে। সুন্দর হেসে একই প্রশ্ন 'হাউ ওয়াজ ইউর উইক এণ্ড" সহপাঠী এরকম একটা প্রশ্ন করতেই পারে, আমি অবশ্য সুদর্শনার দর্শন না পেয়ে কিছুটা নিরাশ হলাম। পরের দু'তিন সপ্তাহ পরীক্ষা, গ্রীষ্মের ছুটিতে একটা ছোটখাট কাজ জোগাড় করার চেষ্টা এসব নিয়ে কাটল, একটা ছোট খাওয়ার দোকানে চাকরী পেলাম, আমার মতো আরও জনা কয়েক বিদেশী ছাত্র ছাত্রী ছিল। দোকানের মালিক কিসের কত দাম, কি করতে হবে এসব শিখিয়ে বলল 'দেখ যখন খরিদ্দারের সাথে কথা বলবে তখন চোখে চোখ রেখে কথা বলবে। যথা সম্ভব হেসে কথা বলবে। একটা আলগা বন্ধুত্বের ভাবও রাখবে কথা বার্তার মধ্যে। এখানে এ ধরনের অনেক দোকান। মিষ্টি ব্যবহার না করলে খরিদ্দার টিকবে না মনে রেখো। প্রথম দিন দুই পুরোনো কর্মচারীরা কি ভাবে খরিদ্দারদের সাথে কথা বলে সেটা ভালো করে দেখ এবং শেখ। তুমি কি ভাবে কথা বলছ, কি রকম ব্যবহার করছ তা দিন কয়েক দেখার পরই কিন্তু ঠিক করব তোমাকে গোটা গরমের ছুটিতে রাখব কিনা।' কথা শুনেই আমরা সেই মধুরবাসিনীর কথা মনে পড়ে গেল। মহিলা তাহলে নেহাৎই চাকরী বাঁচাতে চোখে চোখ রেখে, মৃদু হেসে কথা বলেছিলেন, আমিই ভুল বুঝেছি। আসলে এদেশে ভীষণ প্রাচুর্য এবং ক্রেতার প্রয়োজনের তুলনায় বিক্রেতা বেশী। ফলে ক্রেতাকে যথাসাধ্য তোয়াজ করলে তবে ব্যবসা চলবে। দোকানে বাজারে যে ভালো ব্যবহার পাও তার একটা বড় কারণ হচ্ছে এটা ক্রেতার বাজার বলে। আমাদের দেশের মতো বিক্রেতার বাজার নয়। তাই বলছি কি বিটুবাবু, দোকানের ব্যাঙ্কের বা খাওয়ার দোকানের কাউন্টারের মহিলা বা পরিচালিকা চোখে চোখ রেখে হেসে কথা বললে ভেবো না সে তোমার হাতে হাত রাখতে ইচ্ছুক। তিন পা হাঁটা বা সাতপাকে বাঁধা পড়া তো আরও দূরের কথা। তাই বলি কি খোলা জানলার সামনে দাঁড়িয়ে অজয় চক্রবর্তীর সুরে গান ধোরো না— 'সেই ছলনাময়ী আজও ধরা দিল না।'

আমি থামতে বিটুবাবু বিষণ্ণ মুখে একটা চাপা দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল।

রবিবার সকালে ব্রজদা ও ভুটকিদিকে চিঠিতে জানালাম— "নবাগত বিটুর শিক্ষা দীক্ষার ব্যাপারে আমরা যথাসাধ্য চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি। বাকীটা আল্লার মর্জি।"